# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ১৭ সংখ্যা | ৭ - ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা


# শুধু ভোটে নয়, বিজেপিকে আদর্শগত ভাবে পরাস্ত করতে হবে

বিজেপি আবার শুরু করেছে মন্দির রাজনীতি। গত চার বছর পড়ে থাকা আলখাল্লাটিকে ধুলো ঝেড়ে আবার গায়ে চাপিয়েছেন বিজেপি নেতারা। স্লোগান তুলেছেন, 'মন্দির ওহি বনায়েঙ্গে'। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর পাঁচশো বছরের পুরনো যে ঐতিহাসিক স্থাপত্যকর্মটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি-সংঘ বাহিনী সেই বাবরি মসজিদের জায়গাটিতেই বানাতে হবে রামমন্দির। সামনে লোকসভা নির্বাচন। তাঁদের আশা এই স্লোগানে ফয়দা উঠবে নির্বাচনে। হিন্দু ভোট একত্রিত হবে। রক্ষা পাবে তাঁদের গদি। ৬ ডিসেম্বর দিনটিকে সামনে রেখে বিজেপি-সংঘ পরিবারের নেতারা দেশের নানা প্রান্তে অসংখ্য রথযাত্রার কর্মসূচি নিয়েছেন যাতে দেশজুড়ে একটা সাম্প্রদায়িক আবহ তৈরি করা যায়। এই ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে ৬-১২ ডিসেম্বর 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সপ্তাহ' পালনের আহ্বান জানিয়েছে দেশবাসীর কাছে। নিয়েছে অসংখ্য কর্মসূচি।

কিন্তু গত নির্বাচনে বিজেপি নেতারা যে স্লোগানগুলি তুলেছিলেন— 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ', 'আচ্ছে দিন', 'স্বচ্ছ ভারত', 'কালো টাকা উদ্ধার', এমন আরও কত কী— সেগুলি কোথায় গেল? এবার আর সেগুলি তুলছেন না কেন! সব ছেড়ে মন্দির রাজনীতিতে ফিরতে হল কেন বিজেপিকে?

গত চার বছরে এই স্লোগানগুলির প্রত্যেকটিই ভাঁওতা প্রমাণিত হয়েছে। বিজেপি সরকার পাশে থেকেছে শুধুমাত্র দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের। বিকাশ হয়েছে শুধু তাদেরই এবং তা অভাবনীয়, আকাশছোঁয়া। দেশজুড়ে জনগণের সম্পত্তি তারা লুঠ করে চলেছে অবাধে। এই সরকার যে দেশের কোটি কোটি সাধারণ শ্রমিক কৃষক গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের সরকার নয়, পুঁজিপতিদের সরকার তা আজ প্রমাণিত। বাড়ছে মানুষের ক্ষোভ। ফেটে পড়ছে বিক্ষোভে। বিজেপি নেতারাও শুনতে পাচ্ছেন সেই বিক্ষোভের আওয়াজ।

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

**৬-১২ ডিসেম্বর**

**সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সপ্তাহ পালন করুন**

**কলকাতা ও শিলিগুড়িতে**

**১২ ডিসেম্বর ধিক্কার মিছিল**

# বিষমদে মৃত্যু চলছেই প্রশাসন ব্যস্ত দায় এড়াতে

**নদিয়ায় এসইউসিআই (সি)-র ডাকে ১২ ঘন্টা বনধ**

নদিয়ার শান্তিপুরে স্বজন হারানোর হাহাকারে বাতাস ভারী। মৃত্যুর সংখ্যা ১২। মৃত এবং বিষমদের প্রতিক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে আরও যাঁরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, সকলের পরিবারের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দাবি জানানো হয়েছে— গ্রামে মদ প্রবেশ বন্ধ করুন। সেই দাবিতে মন্ত্রী সাড়া দেননি, তাঁদের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে দায় সেরেছেন।

২০১১ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সংগ্রামপুরে বিষমদে ১৭৩ জনের মৃত্যু, ২০১৩-তে বীরভূমের তারাপীঠে ৮ জনের মৃত্যু, ২০১৫-তে মেদিনীপুরের ময়নায় ২৫ জনের মৃত্যু বা তার পরেও এখানে সেখানে নানা মৃত্যু থেকে রাজ্য

*চারের পাতায় দেখুন*

*৩০ নভেম্বর বনধের সমর্থনে কৃষ্ণনগরে মিছিল*

## পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পতাকা বহন করতে আজ প্রয়োজন

# হাজার হাজার ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা খান, প্রীতিলতার মতো বীর বিপ্লবীর

### জামশেদপুরের সমাবেশে কমরেড প্রভাস ঘোষ

*২৬ নভেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জামশেদপুর শহরের জি টাউন ক্লাব ময়দানে। বিশাল সেই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বাংলায় বক্তব্য রাখেন, যা পরে হিন্দিতে অনুবাদ করে শোনানো হয়। কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য এখানে প্রকাশ করা হল।*

কমরেড প্রেসিডেন্ট, কমরেডস ও বন্ধুগণ,

আপনারা শুনেছেন, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের তৃতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি সমাবেশ ২১-২৫ নভেম্বর ঘাটশিলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ (২৬ নভেম্বর) জামশেদপুরে তার প্রকাশ্য সমাবেশ। ভারতবর্ষের বৃহৎ বুর্জোয়া দল বিজেপি, কংগ্রেস, বামপন্থী দল সিপিআই, সিপিআই (এম) এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলি ঝাঁপিয়ে পড়েছে আগামী নির্বাচনের লক্ষ্যে। কে দিল্লির কুর্সি দখল করবে, কে দিল্লির কুর্সি রক্ষা করবে, কে কোথায় কটা সিট পাবে এই নিয়েই জল্পনা-কল্পনা চলছে। প্রতিদিন খবরের কাগজে, টিভিতে এই সব দলের নেতাদের ভাষণ, নানা কাজের ফিরিস্তি; ভবিষ্যতে কী করবেন তার প্রতিশ্রুতি এইসব নিয়েই প্রচার চলছে। সেই

পরিস্থিতিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমরা আলোচনা করেছি ভারতবর্ষের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত জনগণ যাঁরা শোষণে শোষণে জর্জরিত, অত্যাচারিত, তাঁদের নানান জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কীভাবে শ্রেণি সংগ্রাম এবং গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায় এবং আগামী দিনের পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী প্রস্তুতি চালানো যায়। এই উদ্দেশ্যে আমাদের দলকে আদর্শগত, রাজনীতিগত, নীতি-নৈতিকতাগত সমস্ত দিক থেকে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়, এটাই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, নির্বাচন নয়। আমাদের দল নির্বাচনভিত্তিক দল নয়। আমাদের দল বিপ্লবী দল। আমাদের দল বিশ্বাস করে নির্বাচনের দ্বারা জনগণের কোনও মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা। এটা কমরেড শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার শিক্ষা।

ভারতবর্ষে ১৯৫২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছে, বহুদিন কংগ্রেস রাজত্ব করেছে 'গরিবি হঠাও' স্লোগান তুলে এবং বিজেপিও ক্ষমতায় এসেছে 'আচ্ছে দিনে'র প্রতিশ্রুতি নিয়ে। তার ফল কী হয়েছে, কী হচ্ছে, আপনারা ভুক্তভোগী জনগণ প্রতিদিন দুঃসহ জ্বালায় বুঝছেন। এই দলগুলি সকলেই বলছে, তাদের শাসনে দেশের অনেক উন্নতি হয়েছে, অগ্রগতি ঘটেছে এবং আরও ঘটবে। কিন্তু গোটা দেশের চিত্র কী বলে? সেই সম্পর্কে আমি আপনাদের কিছু তথ্য প্রথম দিকে পড়ে শোনাব, যা আপনারা জানেন নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে, গোটা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে যেটা বাস্তব। এগুলি আমাদের হিসাব নয়, নানা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার হিসাব। বিশ্বের ১১৯টি ক্ষুধার্ত দেশের মধ্যে ভারতের স্থান আগে ছিল ১০০ নম্বরে। এখন আরও পিছিয়ে হয়েছে ১০৩। এই হচ্ছে অগ্রগতি! ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ভারতে অনেক বেড়েছে। এ দেশে প্রতিদিন ২০ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটায়। বিশ্বে যত গরিব আছে, তার তিন ভাগের এক ভাগ গরিব রয়েছে ভারতে। এ

*তিনের পাতায় দেখুন*

# বিজেপিকে পরাস্ত করতে হবে আদর্শগতভাবে

*একের পাতার পর*

বুঝতে পারছেন, তাদের উন্নয়নের, বিকাশের স্লোগান ভাঁওতা তা মানুষ ধরে ফেলেছে। তা হলে উপায়? উপায় সেই ধর্মীয় জিগিরে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ফিরে যাওয়া। দেশের একচটিয়া পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত সেবক বিজেপির ধর্মের জিগির তোলা ছাড়া আর পুঁজি নেই। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মেই একই সাথে শোষিত জনগণের এবং শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির উন্নয়ন ঘটতে পারে না। পুঁজিপতি শ্রেণির উন্নয়নের মূল্য চোকাচ্ছে জনগণ। জনগণের উপর অবাধে শোষণ-লুণ্ঠন চালিয়ে মুনাফার পাহাড় জমাচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণি। আর এটা যাতে পুঁজিপতিরা নির্ঝঞ্ঝাটে চালাতে পারে সরকারে বসে সেই কাজটিই করছে বিজেপি। আর, জনগণ যাতে এই শোষণের চরিত্র ধরতে না পারে, তার জীবনের সমস্ত সংকটের মূলে যে এই পুঁজিবাদী শোষণ, এটা বুঝতে না পারে, এর হাত থেকে রেহাইয়ের রাস্তাটা খুঁজে না পায়, যাতে তার দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তার জন্যই বিজেপির এই হিন্দুত্বের জিগির। সাধারণ মানুষের মনে ধর্ম সম্পর্কে যে আবেগ, বিশ্বাস রয়েছে তাকে কাজে লাগাও, তাই দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত কর। পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে, তার জন্য সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে সেই ঐক্যকে ভাঙো। পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে বিজেপি দক্ষতার সাথে এই কাজটিই করে চলেছে।

বিজেপিকে দিয়ে এ কাজ করাতে তাদের পিছনে হাজার হাজার কোটি টাকা ঢেলে চলেছে পুঁজিপতি শ্রেণি। তাদেরই পরিচালিত সংবাদমাধ্যম প্রচার দিচ্ছে দেদার। কিন্তু মাত্র চার বছরেই বিজেপির এই পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী এবং জনবিরোধী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মানুষ। তাদের মনে ক্রমাগত ক্ষোভ জমা হচ্ছে, যা দেশের প্রান্তে প্রান্তে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়ছে। আর সেই ক্ষোভ যাতে সংগঠিত আন্দোলনের আকারে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে, তাই পুঁজিপতি শ্রেণি তাদেরই আর একটি বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসকে মাঠে নামিয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর মুখের গরম গরম বুকনি খবরের কাগজ আর টিভি চ্যানেলগুলি মুহূর্মুহু পৌঁছে দিচ্ছে দেশের মানুষের কাছে। অথচ এই কংগ্রেসই ১৯৮৬ সালে বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে আজকের এই মারাত্মক পরিস্থিতির জমি তৈরি করে দিয়েছিল। ১৯৯২ সালে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারে থাকার সময়ে বিজেপি-সংঘ পরিবার প্রকাশ্য দিবালোকে সংবাদমাধ্যমের সামনে বাবরি মসজিদ ভাঙা সত্ত্বেও তা আটকানোর কোনও চেষ্টা করেনি। বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। মাত্র চার বছর আগেই কংগ্রেসের দুর্নীতি আর অপশাসনে অতিষ্ঠ দেশের মানুষ বিজেপির মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। আজ সেই কংগ্রেসই বিরোধী জোট গড়ে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরানোর ডাক দিচ্ছে। সেই ডাকে গলা মেলাচ্ছে যেমন তৃণমূল কংগ্রেস সহ আঞ্চলিক দলগুলি, তেমনই সিপিএমের মতো বামপন্থী বলে পরিচিত দলগুলিও। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে যে রথযাত্রা দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বালিয়েছিল, এ রাজ্যে সেই রথকে আটকায়নি তৎকালীন সিপিএম সরকার। বিরোধী এই সব দলগুলির কারও লক্ষ্য সরকারি গদির দখল কারও পার্লামেন্টে কিছু আসন বাড়িয়ে নেওয়া। এই দলগুলি মানুষের বিজেপি বিরোধী ক্ষোভকে কাজে লাগাচ্ছে। বিজেপির ব্যর্থতাগুলি তুলে ধরে তাদের ক্ষমতায় বসানোর জন্য বলছে।

এখানে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা দরকার, বিরোধী ঐক্যের দ্বারা বিজেপিকে যদি ক্ষমতা থেকে সরানোও যায়, তবু তার দ্বারা বিজেপির বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পরাস্ত করা যাবে না। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কিংবা এ রাজ্যে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূল এবং অন্য দলগুলি যে রাজনীতির চর্চা করছে তা-ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আর এক রূপ। রাহুল গান্ধী তো নরেন্দ্র মোদির সাথে রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন— কে কত বেশি মন্দিরে যেতে পারেন। একদিকে রাহুল গান্ধী নিজেকে শিবভক্ত বলে প্রচার করছেন, বলছেন, তাঁরা অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের বিরোধী নন। আবার মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যগুলির নির্বাচনে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি বিলোচ্ছে, তারা ক্ষমতায় গেলে কত সংখ্যক গোশালা তৈরি করে দেবে। সংবাদমাধ্যম এর নাম দিয়েছে 'নরম হিন্দুত্ব'।

এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসও বিজেপির সাথে হিন্দুত্ব প্রচারের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। রামনবমী থেকে হনুমান জয়ন্তী পালন— কে কাকে টেক্কা দিতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলছে। যে রামের পুজোর কোনও প্রচলনই এ রাজ্যে ছিল না, মহাকাব্যের নায়ক ছাড়া আলাদা করে দেবতা বলে যার স্বীকৃতি ছিল না, যে হনুমানকে এ রাজ্যের মানুষ দেবতা বলে কখনও মনে করেনি, গণেশের পুজো একমাত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল— দুই দলের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এখন সেগুলিকেই রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই দলগুলির কারও পক্ষেই বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে আদর্শগত ভাবে পরাস্ত করা সম্ভব নয়।

এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে বামপন্থী দলগুলির কর্তব্য ছিল শাসক শ্রেণির এই সর্বনাশা চক্রান্তকে সামনে তুলে ধরে জনজীবন বিপর্যস্তকারী সমস্যাগুলি নিয়ে যুক্ত বামপন্থী গণআন্দোলন গড়ে তোলা, বিজেপি এবং সংঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালানো। সেই কর্তব্য ভুলে গিয়ে সিপিএমের মতো বামনামধারী দলেরও এখন মূল লক্ষ্য বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে পুঁজি করে কোনও নীতির তোয়াক্কা না করে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলির একটা জোটপাটের মধ্য দিয়ে কয়েকটা সিট বাড়িয়ে নেওয়া।

মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস নেতৃত্ব সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার সঙ্গে আপস করে ছিল। ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলে জনগণের মধ্যে পশ্চাৎপদ সামন্তী চিন্তার প্রভাব দূর করে, ধর্ম সম্পর্কে ইতিহাসসম্মত ধারণা তুলে ধরে সমাজের গণতন্ত্রীকরণের কাজটি করেনি। ফলে মানুষের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ, জীবনযাপন সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা থেকেই গিয়েছে। স্বাধীনতার পরেও সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার পরিবর্তে রঙ নির্বিশেষে শাসক দলগুলি তাদের ভোট রাজনীতির কাজে লাগিয়েছে। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এই আপসেরই ফল। তাই আদর্শগত ভাবে সেগুলিকে পরাস্ত করে গণতন্ত্রের যথার্থ ধারণার প্রসার সমাজে ঘটাতে না পারলে, নির্বাচনে বিজেপি পরাস্ত হলেও, তার বিষাক্ত রাজনীতি পরাস্ত হবে না। মনে রাখতে হবে, সাম্প্রদায়িকতা শুধু একটি দলের বিষয় নয়, মানুষকে বিভক্ত করতে এটি পুঁজিপতি শ্রেণির একটি ষড়যন্ত্র। তাই কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় থেকেছে সে যেমন সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করেছে, ভোট রাজনীতিতে ফয়দা তোলার জন্য তাকে ব্যবহার করছে, পরে বিজেপি ক্ষমতায় বসে তার মাত্রা আরও চড়িয়েছে, ভবিষ্যতে যারা ক্ষমতায় বসবে তারাও নানা কায়দায় এর চর্চা চালিয়ে যাবে।

সাম্প্রদায়িকতা বুর্জোয়া শ্রেণির একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করতে হলে তা নীতিহীন ভোটসর্বস্ব রাজনীতি দিয়ে হবে না। প্রয়োজন উচ্চ নীতিনৈতিকতার আধারে শোষণমুক্তির সংগ্রামের সাথে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামকে যুক্ত করে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা। এসইউসিআই (সি) সেই সংগ্রামেই লিপ্ত রয়েছে।

# উচ্ছেদের আগে পুনর্বাসন চাই, খড়্গপুরে বিক্ষোভ

খড়্গপুর শহরের চৌরঙ্গী থেকে কলেজ, ইন্দা, পুরাতন বাজার, কৌশল্যা হয়ে বারবেটিয়া পর্যন্ত ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোডের এই অংশকে চওড়া করার লক্ষ্যে পথের পাশের দোকান, বস্তিবাসীদের ঝুপড়ি উচ্ছেদের আয়োজন চলছে। প্রশাসন প্রচার করছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সম্মতি নিয়েই তারা এ কাজে নেমেছে। অথচ ঘটনা হল, তারা এ নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেও এসইউসিআই(সি)-কে ডাকেনি। এসইউসিআই (সি)-র দাবি, যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা চলবে না, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনে কোনও রকম পক্ষপাতিত্ব করা চলবে না, প্রথমেই হাতিগলা ব্রিজকে প্রশস্ত করে সবরকম যান চলাচল এবং হেঁটে যাতায়াতের উপযুক্ত করতে হবে।

এই সমস্ত দাবিতে ২৯ নভেম্বর দলের খড়্গপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে খড়্গপুর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

## জীবনাবসান

কলকাতা জেলার রাসবিহারী-আলিপুর লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড রথীন্দ্রনাথ গুইন আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২১ নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতার এক নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

১৯৬৯ সালে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে কালীঘাট এলাকায় দলের প্রার্থী ছিলেন বর্তমান পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। এই নির্বাচন প্রচারকালে কমরেড সাধনা চৌধুরী ও প্রয়াত কমরেড শোভা রায়ের মাধ্যমে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে দলের নানা কর্মসূচিতে বিশেষত সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ পরিচালিত রাজনৈতিক ক্লাস, শিক্ষাশিবির, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কিত তাঁর সুগভীর আলোচনা তাকে খুবই অনুপ্রাণিত করে। তিনি ধারাবাহিকভাবে দলের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং দলের নীতি আদর্শ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পথেই নিজেকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করেছেন। ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংগঠন, নাটক প্রভৃতির প্রতি আগ্রহ থাকায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কালীঘাট শরৎ পাঠাগারে নিজ উদ্যোগে নাটকের গ্রুপ তৈরি ও একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেন। 'চারণিক' নাট্যগোষ্ঠীর সাথে তিনি যুক্ত হন। তিনি পরিবারের সদস্যদেরও দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর দুই মেয়ে বর্তমানে দলের সর্বক্ষণের কর্মী।

কালীঘাট শরৎ পাঠাগার পরিচালিত অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে গরিব ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফ্রি-কোচিং সেন্টার, দুঃস্থ মানুষের সেবায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র প্রভৃতির সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন সামনের সারিতে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত বৃত্তি পরীক্ষা বছরের পর বছর এলাকায় দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়াও বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অ্যাবেকা ও গণতান্ত্রিক অধিকার তথা ধর্মনিরপেক্ষতায় গঠিত সিপিডিআরএস প্রভৃতির সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

কমরেড গুইন ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারী। সহকর্মীদের প্রতি ছিল তাঁর অপার ভালবাসা আর মধুর সম্পর্ক। কর্মচারীদের অধিকার দাবি পূরণে সংগ্রামী ভূমিকার জন্য তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের একজন নেতৃত্বকারী প্রতিনিধি। সদালাপী, পরোপকারী, দরদি চরিত্রের জন্য তিনি ছিলেন কর্মচারী তথা শিক্ষকদের অত্যন্ত প্রিয়জন। বিশ্ববিদ্যালয় নীতি-নির্ধারক কমিটি 'কোর্টে' তিনি কর্মচারী প্রতিনিধি হিসাবে দু'দফায় নির্বাচিত হয়েছেন। সর্বস্তরের কর্মচারী-শিক্ষকদের স্বার্থে গঠিত কো-অপারেটিভ সোসাইটি, রিক্রিয়েশন ক্লাব এমনকী পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতির দক্ষ পরিচালনায় তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

দীর্ঘ চাকরি জীবনের সাথে যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মরদেহ পৌঁছালে উপাচার্য সহ বহু অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মচারী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মাল্যদান করেন। কালীঘাট এলাকায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছানোর সাথে সাথে সাধারণ মানুষ, দলের সমর্থক, দরদি, এলাকার বিশিষ্টজন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মরদেহে মাল্যদান করে প্রয়াত কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

২৯ নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতার সুজাতা সদনে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড করুণা ভট্টাচার্য, মূল বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন কমরেড সাধনা চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

**কমরেড রথীন্দ্রনাথ গুইন লাল সেলাম**

# ভারত আসলে দুটি, একটি শোষকের, অপরটি শোষিতের

*একের পাতার পর*

দেশে এ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কৃষক, ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। প্রতিদিন ৭ হাজার লোক অনাহারে মারা যায়। প্রতিদিন ১০ হাজার লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। ৩ হাজার শিশু অপুষ্টিতে মারা যায় প্রতিদিন। আমাদের দেশে বেকার সংখ্যা এখন প্রায় ৭০ কোটির মতো। ১২৩ কোটির দেশ, ৭০ কোটি হচ্ছে বেকার। এই কিছু দিন আগে রেল কর্মখালির বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। ৯০ হাজার পোস্টের জন্য আবেদন করেছিল ২ কোটি ৮০ লক্ষ বেকার যুবক। চিন্তা করুন ভারতের অবস্থা! উত্তরপ্রদেশে ৩৬২ টি পিওনের পোস্টের জন্য আবেদন করেছিল ২৩ লক্ষ এবং তার মধ্যে ২৫৫ জন পিএইচ ডি ছাড়াও এম এ, এম এস সি এবং গ্র্যাজুয়েট আবেদন করেছেন। পশ্চিমবাংলায় ৫ হাজার ৪০০ গ্রুপ ডি পোস্টের জন্য আবেদন করেছেন ১৮ লক্ষ, এর মধ্যেও পিএইচডি, ডক্টরেট আছেন, ইঞ্জিনিয়ার আছেন। এই হচ্ছে এ দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা। এই হচ্ছে দেশের একটা চিত্র।

অন্যদিকে ভারতের অগ্রগতি কি ঘটেনি? অগ্রগতি ঘটেছে বৃহৎ শিল্পপতিদের, বড় বড় ব্যবসায়ীদের। ২০১৬ সালে এক শতাংশ ধনী ভারতের মোট সম্পদের ৫১ শতাংশের মালিক ছিল। আর দু'বছর বাদে এক শতাংশ ধনীর সম্পদ বাড়তে বাড়তে ৭১ শতাংশ হয়েছে। এখন ভারতে ৯০ ভাগ মানুষের যা সম্পদ সেই পরিমাণ সম্পদ হয়েছে ৫৭ জন কোটিপতির। শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির সম্পত্তির পরিমাণ ৩ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা। দিলীপ সিংভির মুনাফা ১ লক্ষ ২৮ হাজার ১২২ কোটি টাকা। গৌতম আদানি ১ লক্ষ ৭০ হাজার ২৩০ কোটি, আজিম প্রেমজি ১ লক্ষ ৩০ হাজার ২৫১ কোটি, বিজেপির প্রেসিডেন্ট অমিত শাহের এই সময়ে সম্পদ বেড়েছে ৩০০ শতাংশ। আর তার ছেলের সম্পদ বেড়েছে ১৬ হাজার শতাংশ। এখন ৮০ লক্ষ কোটি টাকার মালিক হয়েছে অমিত শাহের ছেলে। এমন কী গেরুয়া বসনধারী বাবা রামদেবেরও সম্পদ বেড়েছে ১৭৩ শতাংশ। এঁরা সকলেই শত শত কোটি টাকার মালিক। এই হচ্ছে আর একটা চিত্র। এছাড়া মন্ত্রী, এমপি, এমএলএ সকলেই কোটি কোটি টাকার মালিক। তারা জনগণের সেবার নামে দু'হাতে টাকা লুটছে। শিল্পপতি, বড় বড় ব্যবসায়ী, মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি করা এখন প্রায় বৈধ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। করাপশন হ্যাজ বিকাম দি ল অফ দি ল্যান্ড। শুধু পার্থক্য, কে বেশি চুরি করেছে, কে কম করেছে, কে ধরা পড়েছে, কে ধরা পড়েনি। সরকার দেউলিয়া, বাজেটে বিপুল ঘাটতি, দেশি-বিদেশি ঋণে চলছে। আর যত ভাবে পারে ট্যাক্স বসিয়ে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে সরকার টাকা সংগ্রহ করছে। সম্প্রতি তেলের উপর ট্যাক্স বাবদ ১০ লক্ষ কোটি টাকা আয় করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত পাবলিকের গচ্ছিত টাকাতে থাবা বসাতে চাইছে।

টাকা নেই এই অজুহাত তুলে শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছাঁটাই করছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের টাকা লুটবার জন্য তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। বন্যা-খরা প্রতিরোধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না, সেচ ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত করছে না। অন্যদিকে শিল্পপতিদের ব্যাঙ্ক থেকে ১০ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করতে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের ২ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকা সরকারি প্রাপ্য ট্যাক্স মকুব করে দিয়েছে। এ পর্যন্ত বিদেশে প্রায় ১০০ লক্ষ কোটি টাকা কালো টাকা হিসাবে সঞ্চয় করতে দিয়েছে। তাহলে এইসব দল কার হয়ে কাজ করছে, একবার ভেবে দেখুন।

ফলে দুই ভারত। এক ভারত বৃহৎ শিল্পপতি, বড় বড় ব্যবসায়ীদের ভারত। তাদের কোটি কোটি টাকার সম্পদ বাড়ছে। আর এক ভারত নিরন্ন, ক্ষুধার্ত, বেকারদের, যারা আত্মহত্যা করছে, অনাহারে মারা যাচ্ছে, শিশু বিক্রি করছে। এই দলগুলি কোন ভারতের প্রতিনিধি, তা আপনারা বিচার করে দেখবেন।

এ ছাড়া ভারতের আরও খবর আছে। আজকের কাগজে বেরিয়েছে। নরেন্দ্র মোদি গত ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে টাকা পৌঁছে দেবে। ১৫ লক্ষ টাকা কেন, ১৫ পয়সাও কেউ পায়নি। আজকের কাগজে বেরিয়েছে সরকার নিযুক্ত তথ্য কমিশন জানতে চেয়েছে কত কালো টাকা উদ্ধার হল? সরকার বলেছে জানাব না, জানানো যায় না। কমিশন জানতে চেয়েছে, কোন কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে তার লিস্ট দাও। সরকার বলেছে, সেটাও জানানো যাবে না। তথ্য কমিশন জানতে চেয়েছে, বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে ব্যাঙ্কের টাকা লুঠ করেছে, তার লিস্ট কোথায়? মোদি বলেছেন, সে লিস্টও দেওয়া যাবে না। কারণ পরিষ্কার, সে লিস্টে বিজয় মাল্য, নীরব মোদি, মেহুল চোকসি প্রমুখ বিজেপি নেতাদের বন্ধু রাঘব বোয়ালরা, যারা ব্যাঙ্ক থেকে জনসাধারণের জমানো কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পালিয়েছে, তাদের নাম আছে। তা হলে এরা কাদের স্বার্থে কাজ করছে সেটা আপনাদের বিচার করে দেখতে হবে।

আজ ভারতবর্ষে কোটি কোটি বেকার। কোটি কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে না। কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বলছে বাজার নেই। এখানে যতটুকু শ্রমিক নিয়োগ হচ্ছে, তাও স্থায়ী ভাবে নয়, চুক্তিভিত্তিক। যাদের কাজের সময় নির্দিষ্ট নেই, বেতন নির্দিষ্ট নেই। চুক্তিভিত্তিক কাজ— এই একটা নতুন জিনিস চালু হয়ে গেছে। কর্মক্ষেত্রে কোনও লেবার ল নেই, কোনও অধিকার নেই। গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখুন, গ্রামগুলি শ্মশান হয়ে গেছে। যুবক-যুবতীরা নেই। কারণ, গ্রামে কোনও কাজ নেই। তারা ছুটছে এই শহর থেকে সেই শহরে। বিদেশেও যাচ্ছে। এদের নাম হচ্ছে মাইগ্র্যান্ট লেবার। কোথাও স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে তাদের কাজ নেই। আপনারা জানেন না, এই দেশের ৩ কোটি ছেলেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে কিছু এজেন্ট। তারা হয়েছে স্লেভ লেবার, দাস শ্রমিক। তাদের দেশেও ফিরতে দিচ্ছে না। তাদের একটু রুটি দেয়। মজুরির কোনও ঠিক নেই, বেরোতে পর্যন্ত দেয় না। একদল ব্যবসায়ী প্রতিদিন হাজার হাজার মেয়েদের গ্রাম থেকে নিয়ে আসে চাকরি দেওয়ার নাম করে, কোথাও বিয়ে দেবে বলে, তারপর তাদের বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে। নারী বিক্রির একটা বাজার চলছে। এই ২৬ জানুয়ারি আসবে, মহা উৎসব হবে। নেতারা ভাষণ দেবেন। ১০ তারা, ২০ তারা হোটেলে বিরাট ভোজসভা হবে। সাজসজ্জা হবে, রঙিন আতসবাজি জ্বলবে। তারা খেয়ে উচ্ছিষ্ট ফেলবে ডাস্টবিনে, সেই উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে ফুটপাতের শিশুরা, তারাও মানবসন্তান। লক্ষ লক্ষ শিশু ফুটপাতে জন্মে ফুটপাতেই মারা যায়, কেউ তাদের খোঁজ রাখে না। এরা জানেও না, এদের বাবা কে, মা কে। যখন অন্ধকার নামবে, তখন স্টেশনে, গঞ্জে, শহরে দেখা যাবে আর এক চিত্র। আমাদের বোনেরা, আমাদের মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে, বিক্রি করবে নিজের দেহ। ঘরে অসুস্থ স্বামী, অভুক্ত সন্তান, রোজগার নেই। এই হচ্ছে দেশের অগ্রগতি! কংগ্রেস শাসন করেছে দীর্ঘ দিন। তারপর বিজেপির শাসন। এই দু'টি দল দেশের এই অগ্রগতি ঘটিয়েছে। কার অগ্রগতি ঘটিয়েছে? অগ্রগতি ঘটিয়েছে শিল্পপতিদের, বড় বড় ব্যবসায়ীদের। যারা গরিবের রক্ত-মাংস সব কিছুকে চুষে খায় আর মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। এই কি সেই স্বাধীনতা? যে স্বাধীনতার জন্য কিশোর ক্ষুদিরাম প্রাণ দিয়েছিলেন। শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং প্রাণ দিয়েছিলেন। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র লড়াই করেছিলেন?

ইংরেজের শোষণের পরিবর্তে এসেছে এ দেশের পুঁজিবাদের শোষণ। এ কথাই বলেছেন আমাদের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বলেছেন, জনগণের স্বাধীনতা আসেনি, এসেছে পুঁজিপতিদের লুণ্ঠনের স্বাধীনতা, শোষণের স্বাধীনতা। তিনি বলেছেন, সমাজ শ্রেণিবিভক্ত। একদিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণি, যাদের একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা, আরও মুনাফা। আর একদিকে কোটি কোটি গরিব মানুষ, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত। তারা শোষিত নির্যাতিত। বলেছেন, রাজনীতি দু'টি। একটি হল শিল্পপতিদের রাজনীতি, বড় বড় ব্যবসায়ীদের রাজনীতি, লুণ্ঠনের পক্ষের রাজনীতি, তাদের রক্ষা করার রাজনীতি। আর একটা রাজনীতি যারা শোষিত জনগণের হয়ে লড়াই করবে, সংগ্রাম করবে, বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নেবে। ফলে দেখতে দল অনেক, কিন্তু বাস্তবে রাজনীতি দু'টি। একটা হচ্ছে শোষণকে রক্ষা করার, শোষণকে চালিয়ে যাওয়ার, পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার রাজনীতি। এই রাজনীতির পক্ষে কংগ্রেস, বিজেপি সব। আর একটা রাজনীতি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের, লড়াইয়ের, বিপ্লবের। সেই রাজনীতির প্রতিনিধি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)— একমাত্র বিপ্লবী দল। এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

আজ বহু দিক থেকে আক্রমণ হচ্ছে। শিক্ষার সুযোগ, জ্ঞানের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার নামে ধর্মীয় শিক্ষা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা চালু করা হচ্ছে। অথচ নবজাগরণের সূচনাকারী রামমোহন রায়, তারপর বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, সংস্কৃত শিক্ষা নয়, বেদ-বেদান্ত শিক্ষা নয়, চাই বিজ্ঞান, চাই লজিক, চাই বৈজ্ঞানিক দর্শন। নতুন মানুষ গড়তে হলে এই ধরনের শিক্ষা চালু করা উচিত। কিন্তু তাঁদের এই শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আক্রমণ কংগ্রেস শুরু করেছিল, সেই পথে বিজেপি আরও কয়েক ধাপ এগিয়েছে— বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে, যুক্তির চর্চাকে, তর্ক করার মনকে ধ্বংস করার জন্য, যাতে কেউ প্রশ্ন না করে, তর্ক না করে, বিরুদ্ধতা না করে, অন্ধের মতো নেতাদের মেনে নেয়। সে জন্য তারা ধর্মীয় শিক্ষা চালু করছে— যাতে মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস থাকে। তারা ধর্মীয় উন্মাদনাও সৃষ্টি করছে।

রাম নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে, কে রামের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এই নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। রাম একটা পৌরাণিক চরিত্র, ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। ইতিহাসে রামকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বুদ্ধদেবকে খুঁজে পাওয়া যায়, মহাবীরকে খুঁজে পাওয়া যায়, শঙ্করাচার্যকে খুঁজে পাওয়া যায়। রাম একটা লৌকিক কথা, কাল্পনিক কাহিনি। চার খণ্ড বেদ, ছয় খণ্ড উপনিষদ, গীতা, শংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত— কোথাও রামের উল্লেখ নেই। ভোটের দিকে তাকিয়ে এই রাম নিয়ে লড়াই চলছে। এরা কি যথার্থ হিন্দু? কথিত আছে, রাম জন্মানোর আগেই বাল্মীকি নাকি রামায়ণ রচনা করে রামায়ণ কাহিনীতে ভবিষ্যতে কী কী হবে তা বলে যান। কই সেখানেও তো অযোধ্যায় রামমন্দির ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ তৈরির কথা বলা নেই! তুলসীদাসের রামায়ণকে তো ভিত্তি ধরা হয়। সেই সময় তো বাবরি মসজিদ ছিল। তুলসীদাস কি লিখেছেন যে বাবরি মসজিদ হয়েছে রামের জন্মস্থানের উপরে?

আমি প্রশ্ন করতে চাই, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ— হিন্দুরা যাঁদের অবতার হিসাবে মানে, তাঁরাও তো বাবরি মসজিদ দেখেছেন। এঁরা তো কেউ বলেননি রামের জন্মস্থানের উপর বাবরি মসজিদ হয়েছে! তা হলে চৈতন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এঁরা কি কাপুরুষ ছিলেন? মন্দির-মসজিদ নিয়ে এই খেলা শুরু করেছিল প্রথম কংগ্রেস। রাজীব গান্ধী ১৯৮৬ সালে বাবরি মসজিদের তালা খুলে রাম পুজো শুরু করালেন। বিজেপি দেখল মহা বিপদ। রামকে কংগ্রেস হাতিয়ার করছে। অমনি বিজেপি রামচন্দ্র নিয়ে রথযাত্রা শুরু করে দিল, দেশে রক্তাক্ত দাঙ্গা বাধাল। স্লোগান তুলল, বাবরি মসজিদ ভাঙতে হবে। তারপর ১৯৯২ সালে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর সহায়তায় বাবরি মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। এখন আবার ভোটের আগে ওখানে রামমন্দির তৈরির আওয়াজ তুলে খেলা শুরু করেছে।

আমরা মার্কসবাদী, নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু আমি বলতে চাই, ওরা কি হিন্দুধর্ম মানে? বিবেকানন্দ বলেছেন, আগে ক্ষুধার্ত মানুষকে রুটি দাও, তারপর ধর্মের কথা বলবে[১]। এই হচ্ছেন বিবেকানন্দ। দেশের কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষ, তাদের জন্য কী করছ? এমনকী মন্দির তৈরির বিরুদ্ধতাও করেছেন।[২] বিবেকানন্দ বলেছেন, আমার যদি একটি ছেলে থাকত, সে বড় হলে বৌদ্ধ হতে পারে, আমার স্ত্রী খ্রিস্টান হতে পারে, আমি নিজে মুসলিম হতে পারি। তাতে ক্ষতি কী? বিবেকানন্দ বলেছেন, কোনও ধর্ম অন্য ধর্মকে আঘাত করে না[৩]। বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ নিজে মসজিদে নামাজ পড়েছেন, গির্জাতে প্রার্থনা করেছেন, আবার কালীপূজাও করেছেন। এঁরা কি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি, নাকি আজকের বিজেপি নেতারা হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি? এদের প্রশ্ন করুন, এই উন্মাদনা কেন? স্রেফ ভোটের দিকে তাকিয়ে। যখনই ভোট আসে তখনই রামের ধ্বনি ওঠে, রামমন্দিরের স্লোগান ওঠে, তখনই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। এ একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

বিজেপির দু'টি লক্ষ্য এখানে কাজ করছে। একটা হল হিন্দু ভোটকে সংহত করা। এখন মোদি আর রাহুল গান্ধীর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে, কে আগে কোন মন্দিরে ঢুকবে। কে কত বড় হিন্দু প্রমাণ করার জন্য এই প্রতিযোগিতা চলছে। আর একটা লক্ষ্য হচ্ছে, জনগণের ঐক্য ভেঙে দাও। গরিব শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত একে অপরকে ঘৃণা করুক। আমি হিন্দু, তুমি মুসলিম। আমি আপার কাস্ট, তুমি লোয়ার কাস্ট। তুমি দলিত, ও ট্রাইবাল। এই ভাবে জনগণকে বিভক্ত করে দাও, যাতে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়তে না পারে। তাই ধর্মভিত্তিক, জাতপাতভিত্তিক বা ট্রাইবভিত্তিক বিদ্বেষের আগুন জ্বালানো হচ্ছে।

আর একটা দিক হচ্ছে, মানুষের মধ্যে অন্ধ

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

# মদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-যুব-মহিলারা

*১ ডিসেম্বর ডিওয়াইও, ডিএসও এবং এমএসএস-এর উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় মদ বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল। সম্প্রতি দেউলি এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় ড্রেনে পড়ে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হয়।*

## প্রশাসন ব্যস্ত দায় এড়াতে

*একের পাতার পর*

প্রশাসন যে কোনও শিক্ষাই নেয়নি, মদ বন্ধের কোনও উদ্যোগই নেয়নি, শান্তিপুরের ঘটনা সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

আইন অনুযায়ী, চোলাই মদের কারবার বন্ধ করা সরকারের দায়িত্ব। বেঙ্গল এক্সাইজ আইনে চোলাই মদ কারবারিদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করার কথা বলা হয়েছে। রাজ্য সরকার এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করছে না। বরং পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে আইনের নানা ফাঁক দিয়ে অপরাধীরা গ্রেপ্তার এড়াচ্ছে অথবা সহজে জামিন পেয়ে যাচ্ছে এবং আবগারি অফিসার ও পুলিশকে মাসোহারা দিয়ে একইভাবে চোলাই কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। এলাকার জনগণ বিশেষ করে মহিলারা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে পুলিশ মদ ব্যবসায়ীদের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। কোথায় মদ তৈরি হচ্ছে, কোন পথে তার পরিবহণ এবং বিপণন হচ্ছে সব জেনেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। ফলে রাজ্য সরকার এই মৃত্যুর দায় কোনও অবস্থাতেই এড়াতে পারে না।

রাজ্য সরকার কখনও কখনও লোক দেখানো হানায় চোলাই কারবারিদের দু-একজনকে গ্রেপ্তার করলেও তার সামগ্রিক অবস্থান মদের ঢালাও প্রসারের। রাজ্যের তৃণমূল সরকার মদের ক্ষেত্রেও পূর্বতন সিপিএম সরকারের নীতিই অনুসরণ করছে। প্রচুর মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়েছে। এ বছর সরকার আরও ১১০০ মদের লাইসেন্স দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে! প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে মদ ভাটি খুলবে বলে শোনা যাচ্ছে। সরকারি মদের জোগান বাড়াতে সমস্ত বিলিতি মদ ও বার-রেস্তোরাঁতে দিশি মদ বিক্রির অনুমতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে সিপিএম সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির যে অজুহাত দিত, তৃণমূল সরকারও তাই দিচ্ছে।

সরকার চালাতে রাজস্ব দরকার এ কথা কেউই অস্বীকার করে না। তাই বলে মানুষকে মৃত্যুপথে ঠেলে দিয়ে রাজস্ব আদায়! রাজস্বই আসল লক্ষ্য হলে সরকার বড় বড় পুঁজিপতিদের ট্যাক্স ছাড় দেওয়া বন্ধ করুক, তাদের সম্পদের উপর ট্যাক্স বাড়াক, প্রশাসনিক অপচয়-চুরি-দুর্নীতি বন্ধ করুক, এম এল এ-এম পিদের রাজকীয় বেতন-ভাতা-সুবিধা প্রদানে রাশ টানুক, সরকারি টাকায় দান-খয়রাতি করে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি, খেলা-কার্নিভাল ও নানা উৎসবে টাকার অপচয় বন্ধ করুক। সরকার সে পথে যাচ্ছে না কেন?

সমীক্ষা বলছে, পথদুর্ঘটনার একটা বড় কারণ মদ্যপান। হাইকোর্টকে যে কারণে বলতে হচ্ছে, জাতীয় সড়কের ৫০০ মিটারের মধ্যে মদের দোকান থাকা চলবে না। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ইত্যাদির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে অপরাধীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মদ্যপ। ধারাবাহিক মদ্যপানে লিভার, কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুও ঘটছে। এসব জেনেও সরকার এতবড় একটা ক্ষতিকর কাজের ঢালাও ছাড়পত্র দিচ্ছে কেন?

পুঁজিপতিদের দেদার কর ছাড় দেওয়ায় রাজকোষ ঘাটতি মেটাতে মদের লাইসেন্স দিয়ে টাকা তোলা সরকারের প্রথম লক্ষ্য হলেও দ্বিতীয় লক্ষ্যটি অবশ্যই মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে দিয়ে

*মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে, সার্কুলার পুড়িয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে ২ ডিসেম্বর ছাত্র-যুব-মহিলাদের বিক্ষোভ*

চেতনাকে ভোঁতা করে দেওয়া। এমনতরো মানুষই শাসকের পক্ষে সুবিধাজনক। তারা রাষ্ট্র নিয়ে, সরকার এবং সরকারের কাজ নিয়ে, সরকারের জনবিরোধী নীতি নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলবে না, তর্ক করবে না। তেমনই ভাববে না সমাজের ভাল-মন্দ নিয়েও। এমন নিষ্ক্রিয় জনসমাজই শাসকরা চায়।

সস্তার ভেজাল মদে শান্তিপুরে যাঁরা মারা গেলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই দিনমজুর। কেউ ভ্যান চালান, কেউ ইটভাটায় কাজ করেন। ঘরে অভাব অনটন। বাস্তব জীবনের দুঃখকষ্ট ভুলতে এঁরা সারা দিনের রোজগার ভেঙে মদ্যপান করেন। মদ ব্যবসায়ীরা নেশা তীব্র করতে ইথাইল অ্যালকোহলের সাথে মিশিয়ে থাকেন মিথাইল অ্যালকোহল। কোনও ক্রমে এর মাত্রা বেড়ে গেলেই মদ পরিণত হয় বিষমদে। এই মৃত্যু ফাঁদ সরকারি সৌজন্যে বহাল তবিয়তে চলছে। ২০০০ সালে সিপিএম জমানায় নদিয়ার কৃষ্ণনগরে বিষমদে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০০৯ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জমানায় তমলুকের রামতারকে বিষমদে মৃত্যু হয়েছিল ৪৮ জনের। সরকার বদলেছে। বদলায়নি তার মদনীতি। চলছে মৃত্যুমিছিল।

মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে ৩০ নভেম্বর এসইউসিআই (সি) নদিয়া জেলা বনধের ডাক দেয়। জেলার সর্বত্র শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই বনধকে স্বাগত জানান। বনধের প্রচারকালীন জনগণ বলেন, সরকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নামে মৃত্যুর দায় এড়াচ্ছে। স্কুল, কলেজ, বাজারে বনধের প্রভাব ছিল ভালই। সমস্ত আদালত ছিল পুরোপুরি বন্ধ। দলের জেলা সম্পাদক মৃণাল দত্ত বলেন, রাজ্যে মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবিতে এসইউসিআই (সি)-র আন্দোলন চলবে।

# সিবিসিএস-সেমেস্টার জটিলতার দায় ছাত্রদের উপর চাপানো চলবে না

কলেজে কলেজে সিবিসিএস-সেমেস্টার পদ্ধতির জটিলতার জন্য উদ্ভূত হাজিরা সমস্যা সম্পর্কে অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ ৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

'সিবিসিএস পদ্ধতির অঙ্গ সেমেস্টার সিস্টেমে ৬ মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্লাস করানো, প্রশ্নপত্র তৈরি করা, পরীক্ষা নেওয়া, খাতা দেখা, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, টিউটোরিয়াল ক্লাসের মতো সমস্ত কিছু সময়ের মধ্যে করে উঠতেই শিক্ষকেরা হিমসিম খাচ্ছেন। এমনিতেই অসংখ্য শিক্ষকপদ শূন্য। স্থায়ী শিক্ষক পদ না থাকার সমস্যা তো আছেই। ফলে জ্ঞান চর্চার লক্ষ্যে প্রকৃত পড়াশুনাটাই শেষ হতে বসেছে। পাশাপাশি আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকেই পড়াশুনার সঙ্গে অন্য কাজেও নিযুক্ত থাকতে হয়। তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ৬০ শতাংশ হাজিরা দেওয়া সম্ভব হয় না।

নিয়মিত ক্লাস করা, পঠনপাঠনে দায়িত্বশীল হওয়া ছাত্রদের কর্তব্য। কিন্তু সিবিসিএস-এর নিয়মে কলেজে হাজিরার অযৌক্তিক কড়াকড়িতে রাজ্যের বহু কলেজের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী বিপাকে পড়েছেন। এই পদ্ধতির ফলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাতে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপিয়াসী দলের ছাত্র সংগঠনগুলি শিক্ষানীতির মূল সমস্যা সমাধানের দাবিতে টুঁ শব্দটিও না করে সম্পূর্ণ অনৈতিক ও শিক্ষাবিরোধী দাবি উত্থাপন করে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে, যা নিন্দনীয়। উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধানে সরকার ও কর্তৃপক্ষকেই ইতিবাচক উদ্যোগ নিতে হবে। সিবিসিএস-সেমেস্টার বাতিলের দাবিতে সকলকে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

# পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের ডেপুটেশন ঝাড়গ্রামে

অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ, পরিচয়পত্র প্রদান, আশ্রম হোস্টেল কর্মচারীদের প্রতি মাসে পাশবইয়ের মাধ্যমে বেতন প্রদান প্রভৃতি দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন ১৬ নভেম্বর ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শশধর মল্লিক বলেন, সামান্য বেতনে হোস্টেল কর্মচারীরা দীর্ঘ বছর ধরে কাজ করে আসছেন, তাঁদের কোনও ছুটি নেই। সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পাচ্ছেন না। এ দিনের কর্মসূচিতে সংগঠনের জেলা সভাপতি সাবিত্রী হাঁসদা, জেলা সহ সম্পাদিকা তাপসী ঝাসী ও ছবি পাল উপস্থিত ছিলেন।

# ডাক্তার নিগ্রহ সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের প্রতিবাদ

সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর ব্লক ও খড়্গপুর সাব ডিভিশনাল হাসপাতালে চিকিৎসক নিগ্রহ এবং চিকিৎসকদের ইস্তফার পরিপ্রেক্ষিতে সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ২০ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

'সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চিকিৎসক-চিকিৎসাকর্মী সহ পরিকাঠামোর ব্যাপক ঘাটতি এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। এই ঘাটতি পূরণ না করে পরিকল্পিত ভাবে সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যর্থতার সব দায় চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। অবিলম্বে সব শূন্যপদে নিয়োগ সহ পরিকাঠামো ঢেলে না সাজালে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যাপক প্রচার আজ মানুষের মধ্যে অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মানুষ চিকিৎসার যে আশা নিয়ে সরকারি হাসপাতালে আসছে পরিকাঠামোর অভাবে তা পূরণ হচ্ছে না। তাদের ক্ষোভ গিয়ে পড়ছে চিকিৎসকদের উপর। ঘটছে নিগ্রহের মতো ঘটনা। প্রশাসন ও সরকার দর্শকের ভূমিকা নিচ্ছে। ফলে চিকিৎসকদের মধ্যে বাড়ছে হতাশা। তা থেকেই ইস্তফা দিতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে। তিনি বলেন, সরকার হস্তক্ষেপ করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা না করলে যেটুকু স্বাস্থ্য পরিষেবা গরিব মানুষ পাচ্ছেন সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে।

## নবনির্বাচিত পলিটবুরো

কমরেড প্রভাস ঘোষ
কমরেড রণজিৎ ধর
কমরেড মানিক মুখার্জী
কমরেড অসিত ভট্টাচার্য
কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার
কমরেড সি কে লুকোস
কমরেড সৌমেন বসু
কমরেড শংকর সাহা
কমরেড গোপাল কুণ্ডু
কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ
কমরেড সত্যবান

## কেন্দ্রীয় এডিটোরিয়াল বোর্ড

কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী (কনভেনর)
কমরেড কে শ্রীধর
কমরেড শংকর দাশগুপ্ত
কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী
কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী
কমরেড স্বপন ঘোষাল
কমরেড শংকর ঘোষ
কমরেড টি কে সুধীরকুমার
কমরেড এম এন শ্রীরাম

## কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

কমরেড স্বপন ঘোষ
কমরেড মানব বেরা
কমরেড কান্তিময় দেব
কমরেড শংকর দাশগুপ্ত
কমরেড কে শ্রীধর
কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী
কমরেড শংকর ঘোষ

**অফিস সম্পাদক**

কমরেড স্বপন ঘোষ

**কোষাধ্যক্ষ**

কমরেড মানব বেরা


*প্রতিনিধি অধিবেশনের মঞ্চে নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি*

# ‘বামপন্থার পতাকা তোমরাই বহন করছ’, ঝাড়খণ্ডের বামমনস্ক মানুষের অভিমত

*তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিবৃন্দ*

‘বহুৎ দিনোঁ কে বাদ জামশেদপুর মে লাল ঝান্ডা কা ইতনা বড়া র‍্যালি দেখা।’ ২৬ নভেম্বরেই শোনা গিয়েছিল এমন মতামত। সাধারণ মানুষ তো বটেই বামপন্থী মহল এমনকী বহু প্রবীণ মানুষও স্মরণ করেছেন ১৯৫৮ সালে টাটা স্টিলে সর্বাত্মক ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে তৎকালীন বামপন্থী দলগুলির বিশাল মিছিলের কথা। তারপর থেকে জামশেদপুর কোনও বামপন্থী দলের এতবড় মিছিল দেখেনি।

জামশেদপুরের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন সাধারণ শ্রমিক, হকার, খেটে খাওয়া মানুষ তো বটেই, ঝাড়খণ্ডের বুদ্ধিজীবী মহলও বারবার অনুভব করেছেন, বামপন্থী বলে পরিচিত সিপিআই-সিপিএমের এককালের দাপুটে নেতাদের প্রভাব কমতে কমতে তলানিতে ঠেকেছে। পুরনো বামপন্থী বলে কথিত বড় দলগুলির নেতা-কর্মীরা নানা চাওয়া-পাওয়া, প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে দক্ষিণপন্থীদের সাথে ভিড়েছেন। তাই ২৬ নভেম্বরের ৫০ হাজার ছাপানো সমাবেশ আর সুশৃঙ্খল অথচ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা বিশাল মিছিল আশার আলো দেখিয়েছে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুবক এবং বামপন্থী মনোভাবাপন্ন বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের। ২৬ নভেম্বরের পরেও এই মিছিলের আলোচনা যেন জামশেদপুরবাসী ছেড়ে থাকতে পারছেন না।

সেদিন মিছিল যখন বেরল, শেষ নভেম্বরের বেলা ১১টায় রোদের তেজটাও কিছু কম নয়। শুকনো গরম যেন নিমেষে জল শুষে নিচ্ছে মানুষের দেহ থেকে। কিন্তু অক্লান্ত তাঁরা হেঁটেছেন দৃঢ় পায়ে, কণ্ঠে জোর স্লোগান। প্রায় ৮ কিলোমিটার পথ হেঁটেছে মূল মিছিল। এছাড়াও জামশেদপুরের নানা প্রান্ত থেকেও একই সাথে শত শত মানুষ সারিবদ্ধ মিছিলে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে স্লোগান দিতে দিতে এসেছেন সমাবেশ স্থলে। সেগুলির আকারও নিতান্ত কম নয়। সভার মাঠ উপচে মানুষের ঢল বন্ধ করে দিয়েছে পাশের রাস্তা। চারপাশের মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন দাবির প্ল্যাকার্ডগুলি। বেকারদের চাকরি চাই, চাই চাষির ফসলের উপযুক্ত সহায়ক মূল্যের নিশ্চয়তা। মিছিল স্লোগান তুলেছে, পেট্রল-ডিজেল রান্নার গ্যাসের দাম কমাও, ভিটে-মাটি-জমি-জল-জঙ্গলের অধিকার ও জীবিকার অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না। মানুষ দেখেছেন এ তাঁদের দাবি। নারী নির্যাতনের বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত মানুষ এই মিছিলে শুনেছেন নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি। চালু কারখানার ছাঁটাই শ্রমিক, বন্ধ কারখানার বেকার শ্রমিক, অর্ধ-বেকার ক্যাজুয়াল লেবাররা এই মিছিলে খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের নিজেদের দাবি। তাই যখন মিছিলে রাস্তা আটকেছে বহুক্ষণ, উচ্চবিত্ত মুষ্টিমেয় কিছু লোক গাড়ি হাঁকিয়ে মিছিল ভাঙার চেষ্টা করলেই তাদের বাধা দিয়েছেন নিতান্ত সাধারণ স্থানীয় মানুষ।

রাস্তার ধারের এক হোটেল মালিকের কৌতূহলী প্রশ্ন, এত লোক এই দলটার সমর্থক? তাহলে খবরের কাগজ, টিভিতে এদের কথা শোনা যায় না কেন? ভাতের দলা গিলে নিয়ে উত্তর দিয়েছেন সেই হোটেলের ফুটপাতে পাতা টেবিলে বসা এক খদ্দের। পরনের বেশই বলে দেয় দরিদ্র চাষি। কুড়মালি ভাষায় সরল যুক্তিতে বুঝিয়ে দিলেন, টিভি-কাগজ চালায় বড়লোকেরা, গরিবের সত্যিকারের পার্টির কথা ওরা বলবে কেন? দেখা গেল কান পেতে শুনছেন এক বাইক আরোহী জিনস-টি সার্ট-স্নিকার পরিহিত নব্য যুবক।

এক মা চলেছেন বছর দশেকের পুত্রের হাত ধরে। স্বেচ্ছাসেবকদের একজন এগিয়ে গিয়ে বললেন, ওকে নিয়ে হাঁটতে পারবেন? প্রায় ৭-৮ কিলোমিটার রাস্তা। তার উপর এই রোদ! ‘হ্যাঁ, হাঁটতে পারবে আমার ছেলে। ও দেখুক সব, দলটাকে না চিনলে ও মানুষ হবে না।’ মলিন শাড়ি পরা গ্রাম্য মায়ের উত্তর শুনে উপচে পড়া চোখের জল আড়াল করতে ব্যস্ত শহরের কলেজছাত্র স্বেচ্ছাসেবক। ঝাড়খণ্ডের প্রত্যন্ত এলাকা প্রায় পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলের বান্দোয়ান ঘেঁষা গ্রাম পটমদা থেকে বাসে করে এসে পৌঁছেছেন একদল। গরিব মানুষ, একসময় ওখানে ছিল সিপিআইয়ের সংগঠন, পরে দাপট বেড়েছে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার। তাদের কার্যকলাপে মানুষের সমস্যার সমাধান দূরে থাক, জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের ব্যবধান গেছে বেড়ে। তার উপরে বিজেপি এখন হিন্দু- মুসলমান শুধু নয়, তথাকথিত উঁচু-নিচু জাতের বিভেদ বাড়াতে ব্যস্ত। সব দেখে মোহভঙ্গ হয়েছে পটমদার মানুষের। নিজেরা টাকা তুলে গাড়ি ভাড়া করে এসেছেন। তাঁদের আর্জি, ‘আপনারা চলুন আমাদের গ্রামে, সভা করুন। অনেকেই তৈরি হয়ে আছে আপনাদের সাথে যোগ দেবে বলে’।

মিছিলে হেঁটেছেন ঝাড়খণ্ডের নামকরা সাহিত্যিক ডঃ সুভাষচন্দ্র গুপ্তা। এক সময় সিপিআইয়ের সংগঠন প্রগতিশীল লেখক সংঘের রাজ্য সম্পাদক ছিলেন তিনি। ডঃ গুপ্তের একটি পা পক্ষাঘাতে অচল। হাঁটতে খুবই কষ্ট হয়। এসইউসিআই(সি) দলের স্থানীয় নেতৃত্ব তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, কোনও গাড়ি বা অটোতে সরাসরি সভাস্থলে আসতে। কিন্তু বামপন্থার এই তরঙ্গের স্বাদ নিতে চেয়েছেন তিনি প্রত্যক্ষভাবে। বেশ কিছুটা হেঁটেছেন মিছিলের সাথে। সভা শেষে বলে গেছেন, আমার পুরনো দলের প্রতি মোহভঙ্গ সম্পূর্ণ হল। এ দেশে বামপন্থার ঝান্ডা আজ আপনারাই তুলে ধরেছেন সঠিকভাবে। সভায় এসেছিলেন, জামশেদপুরের আশপাশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক। এসেছিলেন ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট কবি অশোক শুভদর্শী। এই বিশাল জমায়েত, তার গাম্ভীর্য, শৃঙ্খলা দেখে অভিভূত তিনি। বিহারের মুজফফরপুর থেকে এই সমাবেশ দেখতে এসেছিলেন দৈনিক জাগরণ পত্রিকার বর্ষীয়ান সাংবাদিক মহম্মদ আখলাক। নেতাদের বক্তব্য এবং এই মহতী সমাবেশ তাঁকে এতটাই নাড়া দিয়েছে যে, ফিরে গিয়ে গভীর আবেগ ঢেলে লিখেছেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। ফেসবুকেও লিখেছেন প্রশংসাসূচক মন্তব্য। যা একদিকে বিহারের বুদ্ধিজীবী মহলকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে, অন্য দিকে সে রাজ্যের কায়েমি স্বার্থবাহী ভোটবাজ দলগুলিকে আশঙ্কিত করে তুলেছে।

এই সমাবেশের আগের দিন জামশেদপুর দেখেছে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা। রামমন্দির নির্মাণের দাবিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভা ছিল সেদিন। মাত্র তিন-চারশো লোকের সেই সভা থেকেই নানা এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে ভাঙচুর-লুঠপাট

*আটের পাতায় দেখুন*

# ভোটে বিজেপির বিরোধিতা করছে বলেই কংগ্রেস সেকুলার হয়ে যায় না

*তিনের পাতার পর*

ধর্মবিশ্বাস জাগিয়ে দাও। তুমি গরিব কেন, বেকার কেন এই সব প্রশ্নের উত্তরে বোঝাও— তোমার অদৃষ্ট খারাপ, কপালের দোষ, পূর্বজন্মের পাপের ফল। এই আম্বানি, আদানি প্রমুখ যারা হাজার হাজার কোটি টাকা লুটছে, শোষণ করছে, এরা পূর্বজন্মে এত পুণ্য করেছে যে ভগবান ওদের পাঠিয়েছে গরিবের রক্ত চুষে খাওয়ার জন্য। চুষে খেয়ে মারার জন্য। এই জন্য ওদের ভগবানের দরকার। আর গরিবকে বোঝানো, তুমি হাসি মুখে না খেয়ে মরো, বিনা চিকিৎসায় মরো, এ তোমার পাপের ফল। বিনা প্রতিবাদে হাসিমুখে সহ্য করলে পরজন্মে পরিত্রাণ পাবে। এইসব শয়তানি চলছে। প্রশ্ন কোরো না, তর্ক কোরো না। কেন এই সব শোষণ-অত্যাচার হচ্ছে তার উত্তর খুঁজো না। কারণ এগুলি হচ্ছে ভগবানের মার। ভগবানের ইচ্ছাই কর্ম। খোদা কা মর্জি, নসিব কা খেল। তাই সকল দুঃখকষ্ট, অন্যায়-অত্যাচারের জন্য অন্য কাউকে দায়ী কোরো না, নিজের পূর্বজন্মের পাপ আর অদৃষ্টকে দায়ী করো! এই সব গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এ সব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন থাকতে হবে।

আর একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলছে। এদেশে যখন ব্রিটিশ শাসকরা ছিল, তারা চেয়েছিল এ দেশের ছাত্র-যুবকরা নোকরি করুক, গোলাম হোক। সেই সময় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিল অসংখ্য ছাত্র-যুবক-যুবতী, যারা হাসতে হাসতে শিক্ষা বর্জন করেছে, চাকরি বর্জন করেছে, ঘর-সংসারের দিকে তাকায়নি, জেলে গেছে, লাঠি খেয়েছে, গুলি খেয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। সেই দিন ছিল যথার্থ যৌবন। আজ এ দেশের শাসকরা যৌবনকে ধ্বংস করছে। বলছে, মদ খাও, জুয়া খেল, সাট্টা খেল, ড্রাগের নেশায় মত্ত থাকো, আর নারীদেহ নিয়ে কুৎসিত নোংরামিতে মত্ত থাকো। ব্লু-ফিল্ম, টিভির মাধ্যমে নানা নোংরা জিনিস তারা প্রচার করছে। ভেবে দেখুন, ছ'মাসের শিশুকন্যা, দু'বছরের শিশুকন্যা, তাকেও ধর্ষণ করা হয়েছে। একবার ভেবে দেখুন, পশ্চিম বাংলার নদিয়ার একশো বছরের বৃদ্ধা মহিলাকে মত্ত অবস্থায় এক যুবক ধর্ষণ করেছে। জন্মদাতা বাবার বিরুদ্ধে মেয়ে অভিযোগ করছে, শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী অভিযোগ করছে। কোন দেশে আমরা বাস করছি! দয়ামায়া, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা সব ধ্বংস করে দিচ্ছে, বৃদ্ধ বাবা-মাকে সন্তান ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, খুন করে সম্পত্তি আত্মসাৎ করছে। এই তো দেশের অগ্রগতি! ধর্ষণ, গণধর্ষণ পশুজগতও করে না। পুঁজিপতি শ্রেণি দেশের যুবকদের এই দিকে ঠেলছে কেন? যাতে যুবকদের যৌবন মরে যায়, বিবেক মরে যায়, মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যায়, তারা অমানুষ হয় এবং যাতে তাদের টাকা দিয়ে কেনা যায়, যে কোনও অমানুষের কাজ করানো যায়। এই যে ভোট আসছে, বেকার যুবকরা মদ খাওয়ার জন্য, নেশা করার জন্য, ফূর্তি করার জন্য হয় বিজেপির ভলান্টিয়ার হবে, না হয় কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হবে। এরা প্রতিবাদ করবে না, সংগ্রাম করবে না। তাই আজ দেশে সুভাষচন্দ্র নিয়ে কোনও চর্চা শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকউল্লা নিয়ে কোনও চর্চা নেই, ক্ষুদিরামকে নিয়ে চর্চা শাসকেরা চায় না। এ দেশের বহু মানুষ রামমোহন বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে না, বিবেকানন্দকেও স্মরণ করে না, এ দেশের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, সুব্রহ্মণিয়ম ভারতী প্রমুখকে স্মরণ করে না। শাসকরা এঁদের ভুলিয়ে দিয়েছে। এঁদের ভুলে যাও, অমানুষ হও, মনুষ্যত্বহীন হও। তা হলেই তারা নিশ্চিন্ত। এই হচ্ছে পুঁজিবাদের আক্রমণ। এ সম্পর্কেও আমাদের দল মানুষকে সজাগ করতে চায় আবার নতুন করে যৌবনকে জাগাতে।

আজ দেশের যে পরিস্থিতি, গোটা দেশে যা হচ্ছে, একবার ভেবে দেখুন— আজ যদি বিদ্যাসাগর থাকতেন, আজ যদি জ্যোতিবারাও ফুলে থাকতেন, বিবেকানন্দ থাকতেন, যদি দেশবন্ধু, লালা লাজপৎ রাই থাকতেন, যদি সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং থাকতেন, তা হলে তাঁরা দেশের মানুষকে কী বলতেন? বলতেন কি কংগ্রেস-বিজেপির গোলামি কর, মসজিদ ধ্বংস করে মন্দির তৈরি কর? বলতেন কি মদ খাও, নেশা কর? নারীদেহ নিয়ে নোংরামি কর? নাকি বলতেন, এর বিরুদ্ধে লড়াই কর, মনুষ্যত্ব নিয়ে দাঁড়াও। একমাত্র আমাদের দল মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আবার এ দেশের মনুষ্যত্বকে যৌবনকে জাগাবার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে এইসব বড় মানুষ ও শহিদদের গৌরবময় স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে, যে স্মৃতিকে এই দলগুলি ও পুঁজিপতি শ্রেণি মুছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে।

আমরা নির্বাচনে নামব। কিন্তু বিপ্লবী আদর্শ ও বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। আমরা সিপিআই-সিপিএমের মতো কংগ্রেসকে সেকুলার তকমা লাগাই না। সেকুলারিজম কথাটার একটা মানে আছে। দর্শনগত ভাবে সেকুলারিজম মানে হচ্ছে, পার্থিব জগৎই সত্য। এর বাইরে কোনও ঐশ্বরিক শক্তি নেই। রাজনৈতিক সেকুলারিজম হচ্ছে, সুভাষচন্দ্রে ভাষায় বলতে গেলে, রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না। রাজনীতি চলবে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা। ভগৎ সিং এই সেকুলারিজমকে সমর্থন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রেমচন্দ এই সেকুলারিজমের কথা বলেছিলেন। আর কংগ্রেস প্রথম থেকেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা বলেছে। গান্ধীজি এ কথা বলেছিলেন ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে, যাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা না হয়। এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ করতে গিয়ে তা হিন্দু ধর্মভিত্তিক, বিশেষত উচ্চবর্ণ হিন্দুভিত্তিক হয়ে গেল। তার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তান সৃষ্টি করালো, না হলে এই সর্বনাশ হত না। ফলে, কংগ্রেস কোনওদিনই সেকুলার ছিল না, আজও নয়। ভোটের ময়দানে বিজেপির বিরোধিতা করছে বলেই কংগ্রেস সেকুলার— এগুলি মিথ্যা কথা, মানুষকে বিভ্রান্ত করা। সিপিএম-সিপিআই কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করছে নিছক ভোটের স্বার্থে, কয়েকটা সিট পাওয়ার জন্য। আমরা এই রাজনীতির চর্চা করি না। ওরা কংগ্রেসকে বলছে গণতান্ত্রিক। যে কংগ্রেস জরুরি অবস্থা জারি করেছে, টাডা-মিসা-এসমা চালু করেছে, সেই কংগ্রেসকে বলছে গণতান্ত্রিক! বিজেপি যেমন দাঙ্গা বাধিয়ে দেশের মাটিকে বারবার রক্তাক্ত করেছে, গণহত্যা করেছে, তেমন কংগ্রেসও কি করেনি? ওড়িশার রাউরকেল্লায়, বিহারের ভাগলপুরে, আসামের নেলিতে, দিল্লিতে কে দাঙ্গা বাধিয়েছিল? কংগ্রেসই তো! ভোটের স্বার্থে আমরা মিথ্যাচার করি না। আমরা সব সময়ই বলেছি, সিপিআই-সিপিএম মার্কসবাদের কথা বললেও, ওরা যথার্থ মার্কসবাদী দল নয়। ওদের অতীত ইতিহাস তা বলে না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এদেশের বুর্জোয়া শ্রেণি গান্ধীজিকে সামনে রেখে ক্ষমতা দখল করার জন্য চেষ্টা করেছে। সেই জন্যই বৈজ্ঞানিক চিন্তা আসতে দেয়নি, ধর্মীয় চিন্তাকে উৎসাহ দিয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলনকে আটকেছে শান্তিপূর্ণ পন্থার নামে। আরেকটা ধারা ছিল, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং, সূর্য সেন, ক্ষুদিরামের ধারা, চন্দ্রশেখর আজাদের ধারা— সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা। এ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই ধারাকে বিপদের চোখে দেখেছিল। যার জন্য সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করেছিল। অনেকেই জানে না এই সব ইতিহাস। এখন সকলেই সুভাষচন্দ্রের ভক্ত! বিজেপিও সুভাষচন্দ্রের কথা বলছে। আপনারা কি জানেন, এই বিজেপির গুরু গোলওয়ালকর স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বলেছিলেন, ভারতবর্ষে যারা ব্রিটিশ-বিরোধিতা এবং ভৌগোলিক সীমার ভিত্তিতে জাতীয় স্বাধীনতার কথা বলে তারা প্রতিক্রিয়াশীল, তারা দেশপ্রেমিক নয়।[৪] এই বিচারে সুভাষচন্দ্র থেকে শুরু করে লালা লাজপৎ, দেশবন্ধু, নেহেরু এমনকী গান্ধীজিও দেশপ্রেমিক নন! এই হলেন গোলওয়ালকর। কারণ, তাঁর দাবি ছিল, হিন্দু ভারতের কথা বলতে হবে। এখন আরএসএস-এর প্রধান মোহন ভাগবত বলছেন, গোলওয়ালকরের এই বক্তব্যটা ওই বই থেকে আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি। কারণ এখন তাদের মুশকিল হচ্ছে। কিন্তু বাদ দিলে কী হবে! স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তো এই কথা বলেছিল। ইতিহাস মুছবে কী করে! আরএসএস কোনওদিন স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিল? কোনওদিন ছিল না। কোনও ভূমিকা তাদের ছিল না। আরএসএস-ই এই বিজেপিকে সৃষ্টি করেছে। এই হচ্ছে তাদের ইতিহাস। সেই সময় মহান স্ট্যালিন অবিভক্ত সিপিআই-কে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে যাঁরা বিপ্লবী, তাঁদের সমর্থন করো![৫] কিন্তু ঐক্যবদ্ধ সিপিআই তা করেনি। সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করে গান্ধীজিকে সমর্থন করেছে। এই হচ্ছে তাদের ইতিহাস। আরও বহু কাজ তারা করেছে যেগুলো মার্কসবাদ বিরোধী। সে দীর্ঘ আলোচনায় আমি আজ যাব না। শুধু বলছি, তারা ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর লড়াইকে জাপানের দালালি বলেছিল। এমনকী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের ষড়যন্ত্রে গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতারা যখন সুভাষ বসুকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করাল, তখনও তারা সুভাষ বসুর পক্ষে দাঁড়ায়নি। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তিনি বিহারের রামগড়ে বামপন্থীদের সংহত করার আহ্বান নিয়ে সম্মেলন ডেকেছিলেন এবং বলেছিলেন, এর দ্বারা ভারতে মার্কসবাদী দল গঠনের পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু সেখানে আমন্ত্রিত হয়েও সিপিআই নেতারা যোগ দেননি। এ কথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, সুভাষ বসুকে যদি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করানো ও বহিষ্কার করা না হত এবং সিপিআই যদি তাঁর বামপন্থাকে সংহত করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁকে শক্তিশালী করত, তাহলে তিনি হয়ত দেশের বাইরে যেতেন না। দেশের ভিতরে থেকে তিনিই তখন ১৯৪২ সালের আগস্ট অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিতেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী বামপন্থী ধারা প্রাধান্য পেত, ইতিহাস অন্যরকম হত।

কিন্তু এই পথে পা না দিয়ে অবিভক্ত সিপিআই নেতৃত্ব হিন্দু ও মুসলিম আলাদা দুই জাতি— এই বিচিত্র তত্ত্ব খাড়া করে সেদিন হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগ, আরএসএস-এর মতোই দেশভাগ সমর্থন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ এক সময় বামপন্থার পীঠস্থান ছিল। সেই অবিভক্ত বাংলা সুভাষচন্দ্রের ঐতিহ্য বহন করেছে। এখানে কংগ্রেসের প্রভাব ছিল না বলতে গেলে। সিপিএম চৌত্রিশ বছরের শাসনে পুঁজিবাদের স্বার্থে, শোষণের স্বার্থে এত অত্যাচার করেছে যে, সেই পশ্চিমবাংলা সিপিএম বিরোধিতা করে এখন বামপন্থাকে বিরোধিতা করছে। সিপিএম বামপন্থার সর্বনাশ করেছে, মার্কসবাদের সর্বনাশ করেছে। এই তো ওদের ভূমিকা। সিপিএম-সিপিআই বহু দিন আগেই আন্দোলনের রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ভোট। ভোটের স্বার্থে ১৯৭৭ সালে এই সিপিএম জনতা পার্টির সাথে ঐক্য করেছিল, যে জনতা পার্টির মধ্যে আরএসএস ছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ী-জ্যোতি বোস একত্রে মিটিং করেছেন কলকাতার ময়দানে, ভোটের জন্যই। আবার, আজকে ভোটের স্বার্থে কংগ্রেসের সাথে ওরা হাত মেলাচ্ছে।

আজ অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে আজ ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতিরা বিভক্ত হয়ে এক অংশ বিজেপিকে, অপর অংশ কংগ্রেসকে মদত দিচ্ছে। পাশাপাশি জাতীয় পুঁজির সাথে আঞ্চলিক পুঁজির দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে এবং তার ফলে আঞ্চলিক পুঁজিবাদী দলগুলিও শক্তিশালী রূপে দাঁড়িয়েছে। দেশের পুঁজিপতিদের এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে শ্রমিক শ্রেণির শক্তিশালী সংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে উঠতে পারত, যদি সিপিএম, সিপিআই সেই সংগ্রাম-আন্দোলনের রাস্তায় যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা সেই পথে না গিয়ে দিল্লির কৃষক সমাবেশে রাহুল গান্ধী সহ অন্যান্য বুর্জোয়া নেতাদের হাজির করাল। কংগ্রেস শাসনে কি কৃষকরা আত্মহত্যা করেনি? কৃষকদের বিক্ষোভে গুলি চলেনি? এদের সহযোগী দল 'লিবারেশন'ও পাটনায় তাদের দলীয় সমাবেশে দুর্নীতির মামলায় কারারুদ্ধ লালুপ্রসাদ যাদবের ছেলেকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে বক্তৃতা করালেন। এই ধরনের সুবিধাবাদী রাজনীতির দৌলতে ২/৫টা এমএলএ/এমপি-র আসন হয়তো পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে যাওয়া বামপন্থী আন্দোলন এসবের দ্বারা আরও দুর্বল হবে। বামপন্থার নামে এইসব সুবিধাবাদী রাজনীতির চর্চা আমরা করি না।

কমরেডস ও বন্ধুগণ, গোটা বিশ্বেই প্রবল সংকট, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সংকট। শোষণে শোষণে জর্জরিত মানুষ, তাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই, বাজার নেই। বিশ্বে পুঁজিবাদের ইঞ্জিন বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকে প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবছে। সে-ই এক সময় বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশনের কথা বলেছিল, এখন বলছে বিশ্বায়ন চাই না। বলছে, আমেরিকা ফার্স্ট, তার স্বার্থই আগে দেখতে হবে। কারণ তার দেশে কোটি কোটি বেকার, চাকরি নেই। কিছু দিন আগে ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট হয়ে গেছে। তার সাথে টক্কর দিচ্ছে আজকের সাম্রাজ্যবাদী চিন, যে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। তার সাথে টক্কর দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া, সাম্রাজ্যবাদী জাপান। তার সাথে টক্কর দিচ্ছে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ। ফলে, আমেরিকা সংকটে, ইউরোপ সংকটে, চিন সংকটে, জাপান সংকটে, রাশিয়া সংকটে। সকলেই চাইছে অন্য দেশের বাজার গ্রাস করতে, কিন্তু নিজের বাজারে ঢুকতে দেবে না। বাজার নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। সকলেই সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে। এই বাজারের দ্বন্দ্ব নিয়েই প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধেছিল। এবার ট্রেড ওয়ার শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটাই উদ্বেগের বিষয়। আরেকটা বিষয়ও লক্ষণীয়, যে পুঁজিবাদ শিল্পবিপ্লবের যুগে জাতীয় বাজার সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছিল, জাতীয় স্বার্থের

*সাতের পাতায় দেখুন*

# জনগণকে শোষক ও শোষিত শ্রেণির দল চিনতে হবে

*ছয়ের পাতার পর*

স্লোগান তুলেছিল, সে পরবর্তীকালে একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের স্তরে এসে মাল্টিন্যাশনাল বা বহুজাতিক সংস্থার জন্ম দিয়েছে। সে এখন জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে যে দেশেই সস্তায় শ্রমিক ও কাঁচামাল পায়, সেখানেই ছুটছে, সেখানেই পুঁজি ইনভেস্ট করে সেখানকার পণ্য দিয়ে নিজের দেশেও বেশি মুনাফা করছে। ফলে আমেরিকার মাল্টিন্যাশনালের নিজস্ব আরও মুনাফার স্বার্থ ও মার্কিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে। মার্কিন রাষ্ট্র গ্লোবালাইজেশনের বিপক্ষে আর মার্কিন মাল্টিন্যাশনালরা পক্ষে। অন্যান্য দেশেরও অবস্থা তাই। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মাল্টিন্যাশনাল ও কর্পোরেট সেক্টররাও দেশে না করে বিদেশে পুঁজি ইনভেস্ট করছে। পুঁজিবাদ আজ জনগণ, দেশ, জাতি— কোনও স্বার্থ দেখে না, যেখানেই বেশি লাভ পাবে সেখানেই ছুটবে। আবার প্রয়োজনে নিজের রাষ্ট্রকেও ব্যবহার করবে। গোটা বিশ্বের পুঁজিবাদ চরম মন্দার মধ্যে ধুঁকছে। ভারতের অবস্থাও ঠিক তাই। পুঁজিবাদ থাকলে এই মন্দার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। কারণ পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি অনিবার্য ভাবেই বাজার ধ্বংস করছে, ক্রমসংকুচিত করছে। যেখানে কোটি কোটি মানুষ বেকার, ছাঁটাই হয়ে আছে, রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত হচ্ছে, সেখানে ক্রয়ক্ষমতা কোথায়? ফলে মন্দা বাড়বেই। আজ পুঁজিবাদের প্রয়োজন সর্বোচ্চ মুনাফা। তার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা নৃশংস শ্রমিক শোষণ।

এর একমাত্র বিকল্প হচ্ছে সমাজতন্ত্র। ১৯১৭ সালে মহান নভেম্বর বিপ্লব দেখিয়েছে যথার্থ পথ কোথায়। ৭০ বছর সমাজতন্ত্র ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকারত্ব বলে কিছু ছিল না, ছাঁটাই বলে কিছু ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিনামূল্যে শিক্ষা-চিকিৎসা ছিল। স্বল্প মূল্যে বাড়ি ভাড়া মিলত। সোভিয়েত ইউনিয়নে একমাত্র শ্রমিক-কৃষকরাই ভোটে দাঁড়াতে পারত। বহু দিক থেকে তারা অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। তারা দেখিয়ে দিয়ে গেছে মার্কসবাদ কী করতে পারে, সমাজতন্ত্র কী করতে পারে। এই সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা তাই রমাঁ রল্যাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী, নজরুল, সুভাষচন্দ্র সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। তাঁরা এই নতুন সভ্যতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং তো নিজেকে মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। বাইরের সাম্রাজ্যবাদ আর সোভিয়েতের অভ্যন্তরে পরাজিত পুঁজিবাদ— উভয়ে হাত মিলিয়ে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। আমরা জানি, এক দিন যখন ধর্ম মহৎ আন্দোলন ছিল, দাসপ্রথার যুগে, সেই সময় ধর্মের ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। প্রত্যেকটি ধর্ম দাবি করত তারা ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান। হিন্দু ধর্ম, মুসলিম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম প্রভৃতি প্রত্যেকটি ধর্ম কখনও এগিয়েছে কখনও পিছিয়েছে। কখনও পরাস্ত হয়েছে কখনও জয়লাভ করেছে। নবজাগরণ থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সময়কাল ধরলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ইতিহাস সাড়ে তিনশো বছরের। আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রকেও বার বার পরাজয়-জয়ের পথে চলতে হয়েছে। আর সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে লড়তে হয়েছে দাসপ্রথা থেকে শুরু করে সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ পর্যন্ত কয়েক হাজার বছরের শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে, কয়েক হাজার বছরের শ্রেণিশোষণকে উচ্ছেদ করেছে ৭০ বছরের সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, এই সময়টা কতটুকু? আমরা জানি, সমাজতন্ত্রই একমাত্র মুক্তির পথ।

যে বুর্জোয়া ফরাসি বিপ্লব পতাকা তুলেছিল সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার, সেটা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত, পদদলিত। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি দাঁড়িয়েছে পার্লামেন্টারি ঠাটবাটের আবরণে ফ্যাসিস্ট অটোক্রেসি। পুঁজিবাদ আজ মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী চরম শত্রু। তাই পুঁজিপতি-শ্রমিক সম্পর্ক টিকিয়ে রেখে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে, মুনাফা লুণ্ঠন ও শ্রমিক শোষণ বজায় রেখে, ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করে জনজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার কোনও সমাধান হবে না। তাই চাই পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

এই যে ভোট হচ্ছে, এ সব কি জনগণ ঠিক করছে, ইজ ইট দি ভারডিক্ট অফ দি পিপ্‌ল? বাই দি পিপ্‌ল, অফ দি পিপ্‌ল, ফর দি পিপ্‌ল? জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণেরই? এই যে ভোটে কোটি কোটি টাকার খেলা— সে টাকা কে দেয়? মালিকরা দেয়। তাদের গোলাম হল বিজেপি, কংগ্রেস— যারা ক্ষমতায় বসে মালিকদের চাকরের মতো কাজ করে। ওরা ভোটে প্রচুর টাকা খরচ করছে। এখন ঘরে ঘরে মোবাইল দিচ্ছে, টিভি দিচ্ছে, সাইকেল এবং আরও কত কিছু দিচ্ছে। যদি পাবলিক বলে আকাশের চাঁদ দিন, তবে বলবে, হ্যাঁ তা-ও দেব, আমাদের ভোট দাও। এই যে এত টাকার খেলা, এ কোথা থেকে আসছে? পাবলিকের মানসিক অবস্থাও দাঁড়িয়ে গেছে— আর তো কিছু পাব না, ভোটের সময় যা পাই তাই ভাল। একটা সাইকেল পেলেই হল, একটা টিউবওয়েল কিংবা একটা শাড়ি বা জামা পেলেই হল— অন্তত কিছু তো পাচ্ছি। এই যে কিছু পাচ্ছি, এটা কে দিচ্ছে? এ তো আপনাকে ঘুষ দিচ্ছে। কে ঘুষ দিচ্ছে? দিচ্ছে মালিকরা। যা দিচ্ছে তার কয়েকশো গুণ আপনার থেকে নিচ্ছে শোষণ করে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে, ট্যাক্স বাড়িয়ে। এই হচ্ছে ইতিহাস। নির্বাচন একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। ইলেকশন ইজ এ বিগ ডিসেপশন। এটা যে প্রহসন, ভোটের দ্বারা যে সমস্যার সমাধান হয় না, বিপ্লবই যে একমাত্র পথ, এ কথা বোঝানোর জন্য, এ নিয়ে জনগণকে সচেতন করার জন্য আমরা নির্বাচনে নামি এবং নামব যতদিন মানুষ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত না হচ্ছে, এটাই হচ্ছে মহান লেনিনের শিক্ষা। বিপ্লবী দল হিসাবে আমাদের শক্তি নিয়ে জনগণকে সংগঠিত করে আমরা যেমন নানা দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন করছি এবং করব, একই ভাবে আমরা নির্বাচনেও লড়ব। আমরা ভোটের সুবিধাবাদী স্বার্থে সিপিএম ও সিপিআই-এর মতো জাতীয় বুর্জোয়া দল ও আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল ও কাস্টিস্ট পার্টিগুলির হাত ধরাধরি করে জনগণকে ঠকাব না। আমরা বাম-গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিগুলির ঐক্য চাই নীতি-আদর্শভিত্তিক শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলনের স্বার্থে।

কমরেডস ও বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে আবেদন, স্বদেশি আন্দোলনে মধ্যবিত্ত ঘরের, গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়েছে, ক্ষমতা দখল করেছে শোষক শ্রেণি, পুঁজিপতি শ্রেণি। এই সর্বনাশ হল কেন? এ দেশের মানুষ রাজনীতি বুঝতে চায়নি। নেতারাও চেয়েছিল মানুষ অজ্ঞ থাকুক, অন্ধ থাকুক। জনগণও ভেবেছে আমরা মূর্খ মানুষ, রাজনীতি অত বুঝি না, নেতারাই যা হোক ঠিক করুক। এর সুযোগ তারা নিয়েছে। সেদিন মানুষ বুঝতে পারেনি, গান্ধীজির সাথে নেতাজির পার্থক্য কোথায়? সেদিন মানুষ বুঝতে পারেনি কেন নেতাজিকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল। আজও যদি মানুষ অন্ধ থাকে, অজ্ঞ থাকে, আর খবরের কাগজ কী বলছে, টিভি কী বলছে, কে কত টাকা দেবে, এর ভিত্তিতে একে ভোট দেব, তাকে ভোট দেব ভাবে— তা হলে বার বার ঠকতে হবে। এই প্রবচন ঠিক নয়, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। রামায়ণের কাহিনি অনুযায়ী রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান সবাই লঙ্কায় গিয়েছিল, কেউ রাবণ হয়নি। বরং রামায়ণের শিক্ষা হচ্ছে, সীতার সর্বনাশ হত না যদি সীতা রাবণকে চিনতে পারত। রাবণ এসেছিল সন্ন্যাসীর ভেক ধরে। সীতা লক্ষ্মণের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করেছিল। আজও ভোটে এই সব নেতারা আসছে এরোপ্লেনে চড়ে, হেলিকপ্টারে চড়ে, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঘুরছে, আর বারবার জনগণের কাছে ভোট ভিক্ষা করছে— আমাদের একবার সুযোগ দিন, আমরা আপনাদের সেবক। আর পিছনে আছে টাকার থলি। এই মোহে আপনারা ভুলবেন না।

জনগণকে রাজনীতি বুঝতে হবে। কে শত্রু, কে মিত্র চিনতে হবে। কোন দল শোষক শ্রেণির হয়ে কাজ করছে, কোন দল শোষিত জনগণের হয়ে কাজ করছে, এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। তাই আমি আপনাদের বলতে চাই, মানুষ অনাহারে মরছে, বেকারত্বের জ্বালায়, ছাঁটাইয়ের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। পরিবার ভাঙছে, সন্তান বৃদ্ধ বাবা-মাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে, দায়িত্ব অস্বীকার করছে, পণের জন্য স্ত্রীকে হত্যা করছে। হাজার হাজার নারী ধর্ষিত হচ্ছে, মেয়েরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এ জিনিস চলবে, না এর প্রতিকার চাই? এই প্রতিকারের একমাত্র পথ পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সেই বিপ্লবের পতাকা বহন করছে আমাদের দল মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে। তাই আবারও আপনাদের আহ্বান জানাব, আপনারা রাজনীতি বুঝুন, সংঘবদ্ধ হোন। কাগজ রেডিও টিভির পিছনে ছুটবেন না। আজকের এই মিটিংয়ের খবর আপনারা কাগজ রেডিও টিভিতে বিশেষ পাবেন না। আমরা লক্ষ লোকের জমায়েত করি, কিন্তু সংবাদমাধ্যমে খবর দেয় না। কারণ তারা জানে, ভারতে এই একমাত্র দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণির দুশমন। বিনা প্রচারে এই দল বাড়ছে। ২৫ টি রাজ্যের সংগ্রামী প্রতিনিধিরা এসেছেন এখানে। আমাদের কোনও এমএলএ-এমপি নেই, সংবাদমাধ্যমে প্রচার নেই। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার জোরে, আদর্শের জোরে আমাদের হাজার হাজার কর্মী কাজ করছে, গ্রামে শহরে মানুষকে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত করছে। আজ প্রয়োজন হাজার হাজার ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা খান, প্রীতিলতা— যারা পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পতাকা বহন করবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা শোষিত জনগণকে, বিশেষত ছাত্র-যুবকদের আজকের দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত করছি। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-মহিলা ও মধ্যবিত্তদের দাবিতে শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তুলছি। এই লড়াইয়ে অন্যান্য বামপন্থী দল ও তাদের কর্মীদের সামিল করানোর চেষ্টা করছি। এই দলকে আপনারা শক্তিশালী করুন, মজবুত করুন যাতে আগামী দিনে

*আটের পাতায় দেখুন*

## জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার এসইউসিআই (সি) গোপালপুর আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সম্পাদক, ক্যানিংয়ের বিশিষ্ট সংগঠক ও জননেতা কমরেড ওয়াজেদ গাজী ১০ নভেম্বর নিজ গৃহে ৭৯ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাদল সরদার, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ইয়াহিয়া আখন্দ, আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড খোকন আখন্দ, নিকারীঘাটা আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড আলকাছ সেখ, কমরেড আমিরুল সরদার, মেরীগঞ্জ-১ আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড আইয়ুব খাঁন সহ শত শত সাধারণ মানুষ তাঁর বাসভবনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হন।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রয়াত কমরেড আমিনুদ্দিন আখন্দ ও শহিদ কমরেড সুজাউদ্দিন আখন্দের নেতৃত্বে গোপালপুর, মেরীগঞ্জ, নিকারীঘাটা সহ বাসন্তীর গ্রামে গ্রামে জোতদার-জমিদারদের অত্যাচার, ভাগচাষি উচ্ছেদ এবং জোর করে বেনাম ও সরকারি খাস জমি দখল করে রাখার বিরুদ্ধে গত শতকের '৬০-এর দশকে মরণপণ লড়াই সংগঠিত হয়েছিল। সেই সংগ্রামে কমরেড ওয়াজেদ গাজী সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। চাষি আন্দোলনের সেই অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে তিনি বেশ কয়েকবার কায়েমি স্বার্থবাহীদের দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হন এবং কারারুদ্ধ হন। ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কমরেড সুজাউদ্দিন আখন্দের নেতৃত্বে প্রায় সব ক'টি আসনে এস ইউ সি আই (সি) জয়লাভ করে এবং কমরেড ওয়াজেদ গাজীও নির্বাচিত হন। '৯৪ সালের নির্বাচনে কমরেড গাজী উপপ্রধান হন। পরে শারীরিক ভাবে একেবারে অক্ষম হয়েও তিনি দলের কর্মকাণ্ডের খোঁজ খবর রাখতেন এবং পরিবারের সদস্যদের পার্টির ঘনিষ্ঠ করার কাজ চালিয়ে গেছেন।

১৯ নভেম্বর বদুকুলা স্কুলমাঠে প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৫ শতাধিক মানুষ উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা জানান। সভাপতিত্ব করেন কমরেড গাজী সাহেবের সহযোদ্ধা প্রবীণ কমরেড রসিদ লস্কর। প্রধান বক্তা কমরেড নন্দ কুণ্ডু বলেন, গরিব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কমরেড ওয়াজেদ গাজী সেদিন যে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা উত্তাল সমুদ্রে সাঁতার কাটার সমতুল। সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে আজ আমরা সংগ্রাম চালিয়ে গেলে, সেটাই হবে তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন।

**কমরেড ওয়াজেদ গাজী লাল সেলাম**

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18



# এমবিবিএস পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত হয়রানি
## ডিএসও-র আন্দোলনে দাবি আদায়

স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অপদার্থতায় এই বছর এম বি বি এস পরীক্ষার্থীরা ফর্ম ফিল আপ করতে গিয়েই চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হলেন। ৪ ডিসেম্বর থেকে এম বি বি এস পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফর্ম ফিল আপ পুরোপুরি অনলাইনে করার নির্দেশ দিয়েছিল। পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ থেকে ফলপ্রকাশ পর্যন্ত পুরো দায়িত্ব তারা তুলে দিয়েছে একটি বেসরকারি কোম্পানির হাতে। অথচ ৩০ নভেম্বর ফর্ম ফিল আপ-এর শেষ দিনে গিয়ে দেখা যায় ওয়েবসাইটের সমস্যায় অর্ধেকের বেশি পরীক্ষার্থী ফর্ম ফিল আপ করতেই পারেননি। আতঙ্কিত পরীক্ষার্থীরা ওই দিন ডিএসও-র নেতৃত্বে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান। প্রথমে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত যাঁরা অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করতে পারেননি তাঁদের অফলাইনে ফর্ম ফিল আপ করার সুযোগ দেওয়ার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।

এ আই ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ডাঃ মৃদুল সরকার বলেন, বেসরকারি সংস্থার হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি তুলে দেওয়ার পর থেকে ডেন্টাল কলেজগুলিতে পরীক্ষার তিনমাস পরেও ফলপ্রকাশ হয়নি, বেসরকারি হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ তুলে দেওয়া বন্ধ করার দাবি জানান তিনি।

# কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ

*সাতের পাতার পর*

আমরা আরও শক্তিশালী আন্দোলন করতে পারি, লড়াই করতে পারি। এই লড়াই করতে করতে আমরা ভোটে নামব। আবার ভোটের পরও আমরা লড়াই চালাব। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**উদ্ধৃতি সূত্র ঃ** (১) বিবেকানন্দ বলেছেন, "ভারতের কোটি কোটি দুঃস্থ মানুষ তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে চাইছে রুটি ...আমরা তাদের পাথর দিচ্ছি। অনাহারী মানুষকে ধর্ম শেখানো ... তাদের অপমান করা" (বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা)।

(২) বিবেকানন্দ বলেছেন, "জীবন্ত ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন তথাপি তোমরা মন্দির, গির্জা নির্মাণ করিতেছ আর সর্বপ্রকার কাল্পনিক মিথ্যা বস্তুতে বিশ্বাস করিতেছ। মানবাত্মা বা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। ...মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির— মন্দিরের মধ্যে তাজমহল" (ঐ,২য় খণ্ড, পৃঃ১৯১)।

(৩) বিবেকানন্দ বলেছেন, " সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ, কেবল পরধর্ম সহিষ্ণুতা নহে — ইহাই আমরা প্রচার করি এবং কার্যেও পরিণত করি। বিশেষ সাবধান, যেন অপরের ক্ষুদ্রতম অধিকারও পদদলিত করিও না" (ঐ৭ম খণ্ড, পৃ ঃ ৩৭)।

(৪) গোলওয়ালকার বলেছিলেন, "ব্রিটিশ বিরোধিতাকে ভাবা হচ্ছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সমার্থক। এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপর বিনাশকারী প্রভাব ফেলেছিল" (চিন্তাচয়ন— ১ম খণ্ড, পৃ ঃ ১২৫)।

(৫) "ভারতের মতো উপনিবেশগুলির মৌলিক ও নতুন বৈশিষ্ট্য শুধু এটাই নয় যে, এখানকার জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবী দল ও আপসকামী দল এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, বরং প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই বুর্জোয়াদের আপসকামী অংশ ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের সাথে একটা বোঝাপড়া গড়ে তুলতে সফল হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও বেশি বিপ্লবের ভয় থেকে এরা নিজের দেশের শ্রমিক ও চাষির বিরুদ্ধেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ব্লক বা জোট গড়েছে ... শহর ও গ্রামের পেটিবুর্জোয়া জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জাতীয় বুর্জোয়াদের আপসকামী অংশকে বিচ্ছিন্ন করার পর, বুর্জোয়াদের বিপ্লবী অংশের সঙ্গে অবশ্যই কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে জোট করতে পারে এবং তা করতেই হবে" (জে ভি স্ট্যালিন)।

# 'বামপন্থার পতাকা তোমরাই তুলে ধরেছ'

*পাঁচের পাতার পর*

করে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তারা। ২৬ তারিখ সভা শেষে সন্ধ্যার পর শহরের রেলিংয়ে লাগানো ফ্ল্যাগ-ব্যানার খুলছিলেন দলের স্বেচ্ছাসেবকরা। ফল বিক্রেতা এক হকারভাই এগিয়ে এলেন গুটিগুটি পায়ে, বললেন, 'কাল ছিল ভিএইচপি, আজ আপনারা। ওরা নাকি ধার্মিক? ওরা কাল খুব অসভ্যতা করেছে। কিন্তু আপনাদের লোকেরা অত্যন্ত ভদ্র। তাহলে কি কলিযুগে ধার্মিকরা সব অভদ্র হয়ে গেছে আর আসল ভদ্র কমিউনিস্টরাই!' মানুষটির নাম ঠিকানা জেনে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা বলে এসেছেন, আপনি ভাবুন। কয়েকদিন পরে এসে আপনার কাছ থেকেই উত্তর শুনব। মানগো এলাকার এক মুদি দোকানদার তেওয়ারিজির ভাষায়, 'যব ভোট আতা হ্যায়, এ লোক রামমন্দির কা মুদ্দা উঠাতা পাবলিক কো ধোঁকা দেনে কে লিয়ে।' বললেন, দেশে কি মন্দিরের অভাব আছে যে আর একটা মন্দির না হলে ক্ষতি হয়ে যাবে?

দক্ষিণপন্থী কায়েমি স্বার্থবাজরা বিপদ দেখেছে এই সমাবেশে। তাই আগের দিন থেকে ঘাটশিলা, জামশেদপুর সহ বহু জায়গায় লাগানো এস ইউ সি আই (সি)-র ফ্ল্যাগ-ব্যানার খুলে ফেলার জন্য ভাড়াটে লোক নিয়োগ করেছিল আরএসএস-বিজেপি। তাদের অনেককে হাতেনাতে ধরে বাধা দিয়েছেন সাধারণ মানুষই। টাটা স্টিল কারখানার সর্ববৃহৎ কংগ্রেসি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আশঙ্কিত হয়ে বলেছেন, এখনই পাল্টা কিছু করা দরকার, না হলে খেটে খাওয়া মানুষ একদিন সব গিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র লাল ঝান্ডাই ধরবে।

# তৃণমূলের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ৯ ডিসেম্বর 'মৈপীঠ সংহতি দিবস' পালনের ডাক দক্ষিণ ২৪ পরগণায়

এস ইউ সি আই (সি)-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি ৯ ডিসেম্বর মৈপীঠ সংহতি দিবস পালনের ডাক দিল। মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর বরাবরই এস ইউ সি আই (সি)-র শক্ত ঘাঁটি। এখানে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি)-কে হারানোর জন্য তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিআই(এম) জোট বেঁধে লড়ে। তা সত্ত্বেও এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রার্থীরা ১১-৮ ব্যবধানে জেতে।

এরপর পরাজিত তৃণমূল কংগ্রেস অনৈতিক উপায়ে এস ইউ সি আই (সি)-র দু'জন পঞ্চায়েত সদস্যকে ভাঙিয়ে প্রধান পদে জেতে। ২০ নভেম্বর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উপসমিতিগুলির নির্বাচন হয়। সেইদিন দলের সমস্ত নেতৃস্থানীয় কর্মী পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধি অধিবেশনের জন্য ঘাটশিলা রওনা হয়ে গেলেও, আঞ্চলিক কর্মীদের সাহসী প্রচেষ্টায় সব ক'টি উপসমিতিতে এস ইউ সি আই (সি)-র জয় হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব, বাইরে থেকে বাইক বাহিনী নিয়ে এসে এলাকার নানা জায়গায় ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। এস ইউ সি আই (সি) দলের যুব নেতা কমরেড সুদর্শন মান্নার বাড়ির আশেপাশে ব্যাপক বোমাবাজি এবং গুলি চালায়। বিনোদপুরে কমরেড পিন্টু মণ্ডল নামে এক কর্মীকে ব্যাপক মারধর করার পর রাত্রে স্থানীয় শ্মশানে ফেলে দিয়ে যায়।

২২ নভেম্বর রাত ৯টা নাগাদ এস ইউ সি আই (সি) দলের মহিলা কর্মী কমরেড কবিতা পাত্র তাঁর বৃদ্ধ শ্বশুর-শ্বাশুড়ি সহ যখন শনিবারের বাজারে তাঁদের চায়ের দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন তখন মৈপীঠের তৃণমূলের অঞ্চল প্রধান সহ সাত-আট জন দুষ্কৃতী মুখে কাপড় বেঁধে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মারতে মারতে তাঁকে রাস্তার পাশে নির্জন জায়গায় টেনে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাঁর জামা-কাপড় ছিঁড়ে দিয়ে তাঁর ওপর বর্বর অত্যাচার চালায় এবং যৌনাঙ্গে লাঠি ঢুকিয়ে দেওয়ায় তিনি সেখানে অজ্ঞান হয়ে যান। বেশ কিছুক্ষণ পরে পুলিশ গিয়ে তাঁকে অজ্ঞান এবং বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করে। এই ঘটনার পরে পুলিশ সে রাতে এবং দু'দিন পরে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তাঁকে ভর্তি করেনি বা ঠিকমতো মেডিকেল পরীক্ষা করায়নি। বরং তৃণমূল নেতৃত্বের চাপে এটা মামুলি ঘটনা এবং চিটফান্ডের টাকা ফেরতের দাবিতে গ্রাহকরা মারধর করেছে বলে ধামাচাপা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। দোষীদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তির দাবিতে দলের আঞ্চলিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত প্রধান সহ এফআইআর-এ নাম থাকা ৫ জন অপরাধীর কারওকেই গ্রেপ্তার করেনি।

এর পরে গত ৩০ নভেম্বর ভোররাতে ৭ নং বাজারের কাছে একটি পরিত্যক্ত আটচালায় পরিকল্পিত ভাবে আগুন লাগিয়ে দিয়ে 'এস ইউ সি আমাদের পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে' এই অজুহাতে তৃণমূল বেশ কিছু লোকজন জড় করে এবং দু'জন এস ইউ সি আই (সি) সমর্থককে মারধর করে। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু, প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী সহ জেলার একটি প্রতিনিধি দল কবিতা পাত্রের বাড়ি গিয়ে দেখা করলে তিনি বলেন, ঘরে দুই শিশু নিয়ে তিনি একা থাকেন। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাঁকে রাত্রে এসে কেস তুলে নেওয়ার জন্য শাসাচ্ছে এবং বাড়ির ভিতরে ঢুকে তাঁকে খাট থেকে ফেলে দিয়ে মারধর করেছে। তিনি বলেন, 'কিন্তু আমি মরে গেলেও তৃণমূলের সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করব না।' এর পরে নেতৃত্বের পক্ষ থেকে মৈপীঠ কোস্টাল থানায় দোষীদের গ্রেপ্তার ও কবিতা পাত্রের নিরাপত্তার দাবি জানান।

গত ৩০ নভেম্বর মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার-এর ডাঃ নীলরতন নাইয়া, সিস্টার ভাস্বতী মুখার্জী, সি পি ডি আর এস-এর অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ, নারী নিগ্রহ বিরোধী কমিটির কল্পনা দত্ত সহ এক প্রতিনিধি দল গুরুতর আহত এবং অসুস্থ কবিতা পাত্রের সঙ্গে দেখা করেন এবং পরে থানার ওসি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিগৃহীতার যথাযথ মেডিকেল পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

# হাওড়ার হোমে মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতন প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

হাওড়ার পারবাকসীর একটি বেসরকারি হোমে কিশোরী সহ মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে ২ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি) হাওড়া গ্রামীণ জেলা সম্পাদিকা কমরেড মিনতি সরকারের নেতৃত্বে নয় সদস্যের এক প্রতিনিধি দল এই ঘটনার পুর্ণাঙ্গ নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি সহ আরও কয়েক দফা দাবিতে স্থানীয় জয়পুর থানায় ডেপুটেশন দেয়।

এ ছাড়াও ওই হোমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো, উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য মহিলা কর্মী নিয়োগের দাবি জানানো হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে উপযুক্ত তদন্ত এবং সমস্ত দোষীদের গ্রেপ্তার করে আইনানুগ শাস্তির ব্যবস্থার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com